প্রভু যিশুর স্বর্গারোহণ মহাপর্ব

প্রকাশনার ৮১ বছর
সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
সংখ্যা : ২১ ● ১৬ - ২২ মে, ২০২১ খ্রিষ্টাব্দ

৫৫তম বিশ্ব যোগাযোগ দিবস

স্বর্গ লাভের প্রত্যাশা

এসো দেখে যাও (যোহন ১:৩৯)

মানুষ যেখানে যে ভাবে আছে তার মুখোমুখি হয়ে যোগাযোগ করো

উত্তরবঙ্গে ভাওয়াল
অভিবাসন পূর্তি (১৯২০-২০২০) উৎসব

প্রেরিতগণের রাণী মারীয়ার সঙ্গিনী সংঘের প্রথম দেশীয় সংঘকর্ত্রী শ্রদ্ধেয়া মাদার আগ্নেশ এসএমআরএ-এর জন্ম শতবর্ষে আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি ও শতকোটি প্রণাম
(১৯ মে, ১৯২১ - ১৯ মে, ২০২১ খ্রিস্টবর্ষ)

শ্রদ্ধাস্পদ মাদার আগ্নেশ,

আজিকে তোমার এই শতবর্ষ জন্ম জয়ন্তীতে
এসএমআরএ পরিবার স্মরিছে তোমারে ভক্তি ভরে।
তোমার এই নিঃস্বার্থ সংঘ সেবা, উদার মাতৃত্ব ও শত কর্মফলের তরে
লহ তুমি তব অজস্র কৃতজ্ঞতা, আন্তরিকতা, শ্রদ্ধা ও ভালবাসা মোদের।
সংঘে তুমি ছিলে যেমন, আছ তুমি আজও তেমন, সবার হৃদ-মাঝারে
অক্ষয় অম্লান হয়ে থাকবে তুমি, যুগ যুগ ধরে ভগ্নীদের মনোমন্দিরে।

শ্রদ্ধেয়া মাদার আগ্নেশ হলেন আমাদের এসএমআরএ, দেশীয় ধর্মসংঘের প্রথম দেশীয় সংঘকর্ত্রী যিনি ১৯৫২-১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত টানা ১৬টি বৎসর ধরে সংঘে অত্যন্ত দক্ষতা ও সফলতার সাথেই নেতৃত্ব দান করেছেন। আজ তার এই জন্ম শতবার্ষিকীতে আমরা তাকে সংঘের প্রত্যেকজন ভগ্নীর পক্ষ থেকে জানাই প্রণতালা একরাশ লাল গোলাপের শুভেচ্ছা ও শতকোটি অভিনন্দন।

নিজ পরিবারে শিশুকাল থেকেই মাদার দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ তিনি একজন সিস্টার হবেন। তার এই যাত্রা শুরু হয়েছিল ১৯৩৩ খ্রিস্টবর্ষে। তিনি মাত্র পঞ্চম শ্রেণী পাশ করেই এসএমআরএ ধর্মসংঘে প্রবেশ করেন। ১৯৩৬ খ্রি. ১৫ মার্চ তিনি মাত্র ১৩ বৎসর বয়সে সংঘে ধর্মীয় পোষাক লাভ করেন। তার বাপ্তিস্মের নাম ছিল এডলিনা পিউরীফিকেশন। সিস্টার হয়ে তিনি নাম গ্রহণ করেন সিস্টার মেরী আগ্নেশ। তিনি ১৯৪৫ খ্রিস্টবর্ষে ৬ জানুয়ারী ২৫ জন সিস্টারের সাথে তিন বছরের জন্য এবং ১৯৪৮ খ্রিস্টবর্ষে ৬ জানুয়ারীতে তিনি আজীবন ব্রত গ্রহণ করেন। সিস্টার আগ্নেশ হলেন সংঘের অষ্টম সিস্টার। এরপর ১৯৪৫-১৯৫০ খ্রি. তিনি আইএ ও বিএ ডিগ্রী লাভ করেন ভারতে শিলং, সেন্ট মেরীস কলেজ হতে। ১৯৫২ খ্রি. সিস্টার আগ্নেশ সংঘের সিস্টারদের মধ্য থেকে প্রথম দেশীয় সংঘ প্রধান নিযুক্ত হন। ১৯৬০ খ্রি. এই সংঘের প্রথম মহাসভা হয়। মহাসভায় আর্চবিশপ কর্তৃক সিস্টার আগ্নেশ তিন বৎসরের জন্য প্রথম সংঘকর্ত্রী নির্বাচিত হন। আর এ সময়ই তাকে 'মাদার' নামে আখ্যায়িত করা হয়।

ভাবতেও অবাক লাগে যে কি করে মাদার সেদিন এত অল্প বয়সে ঈশ্বরের ডাক শুনে তাতে সাড়াদান করেছিলেন! বর্তমানে তা যে কল্পনারও অতীত। তবে মাদার ছোট বেলা থেকেই ছিলেন অত্যন্ত শান্ত, নম্র-বিনীত ও কোমল স্বভাবের একজন খুবই ভাল মেয়ে। যিশুকে ভালবাসা এবং তাঁর রাজ্য বিস্তারের জন্য কাজ করার এক অদম্য বাসনাই তাকে অতি সহজে সংসার বিরাগী হতে প্রেরণা যুগিয়েছে। তিনি যে শুধু ঈশ্বরকেই ভালবেসেছেন তা কিন্তু নয়! তিনি সেইসাথে অসহায়, হত-দরিদ্র ভাই-মানুষ, অনাথ শিশু-কিশোরদেরকে, বিশ্ব প্রকৃতি তথা পশু-পাখিদেরও অনেক ভালবাসতেন। সবার ও সব কিছুর প্রতিই তার ছিল এক অমায়িক সহানুভূতিশীল উদার হৃদয় ও মন। অন্যের দুঃখকষ্টে তিনি নিজেও ব্যথিত হতেন। আবার অন্যের আনন্দে তিনি আনন্দিত হতেন। সবাই অতি সহজে মাদারের কাছে আসতে পারতেন এবং আশ্রয়ও পেতেন। একবার এক পঞ্চম শ্রেণীতে অধ্যয়নরত ছোট্ট শিশু, স্কুলে মারামারি করে, দোষ করে, ভয়ে পালিয়ে সুদূর কুমিল্লা থেকে কাউকে না বলে এই বটমলী হোম অর্ফানেজে একাই গাড়ীতে উঠে সোজা মাদারের কাছে চলে এসেছিলো এবং মাদারও গভীর স্নেহে সব জেনে তাকে সেদিন আশ্রয় দিয়েছিলেন। মাদার ১৯৭০ খ্রি. ১৫ অক্টোবর রজত জয়ন্তী এবং ১৯৯৫ খ্রি. ১৩ অক্টোবর সংঘে তিনি সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব উদ্‌যাপন করেন। অবশেষে এমনি দরদী এবং সবার প্রিয় মাদার ১৯৯৯ খ্রিস্টবর্ষে ১০ ফেব্রুয়ারী সকাল ৮ঃ৫২ মিনিটে, তুমিলিয়া মাতৃগৃহের শান্তিভবনে ৭৮ বৎসর বয়সে আমাদেরকে ছেড়ে পিতার ডাকে সাড়া দিয়ে ইহধাম ত্যাগ করেন। আজকের এই জন্ম শতবার্ষিকীতে আমরা তার আশীর্বাদ চাই ও তার বিদেহী আত্মার চির শান্তি কামনা করি।

শ্রদ্ধেয়া মাদারের পর যারা এই দেশীয় সংঘটির হাল ধরেছিলেন এবং পরম্পরাগতভাবে যারা সংঘে নেতৃত্ব দিয়ে আসছেন তারা হলেন- সিস্টারস মেরী পেট্রা, মেরীলিন, ছেরেজা, প্রীতি, দীপ্তি, অনিতা এবং বর্তমানে সিস্টার মেরী মিনতি। আজকের এই শুভ দিনে মাদারের সাথে তাদের প্রতিও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি। প্রার্থনা করি মাদার যেন স্বর্গ থেকে তার এই রেখে যাওয়া প্রিয় সংঘটিতে এমনিভাবে আরও অনেক সুযোগ্য পরিচালিকা পাঠিয়ে দেন যারা এই ধর্ম সংঘটিকে বাংলাদেশ মণ্ডলীতে ঐশরাজ্য বিস্তারের কাজকে আরও ত্বরান্বিত করতে, সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবেন। সর্বশক্তিমান ঈশ্বর সবার মঙ্গল করুন এবং এই জন্ম শতবর্ষে শ্রদ্ধেয়া মাদারকে স্বর্গে চির সুখী করুন। এই কামনায়-

এসএমআরএ পরিবার
বাংলাদেশ

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

বর্ষ : ৮১, সংখ্যা : ১৭
১৬ - ২২ মে, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ
২ - ৮ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

সম্পাদক
ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

সম্পাদকীয় বোর্ড
ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

সহযোগিতায়
সুনীল পেরেরা
জ্যাষ্টিন গোমেজ

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা
ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

প্রচ্ছদ ছবি
সংগৃহীত, ইন্টারনেট

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন
মেরী তেরেজা বিশ্বাস
লিটন ইসাহাক আরিন্দা

বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স
দীপক সাংমা
নিশুতি রোজারিও
অংকুর আন্তনী গমেজ

মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫

চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক
চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫
E-mail : wklypratibeshi@gmail.com
Visit : www.weekly.pratibeshi.org

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র ৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষীবাজার ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সম্পাদকীয়

যথার্থ যোগাযোগ উন্নয়নের সহায়ক

মানব জীবনের প্রতিক্ষণেই যোগাযোগ হচ্ছে। কখনো অপরের সঙ্গে, কখনো ঈশ্বরের সঙ্গে আবার বেশিরভাগ সময় নিজের সঙ্গে। যোগাযোগ ছাড়া মানব জীবন সচল থাকতে পারে না। মানব সম্পর্কের অক্সিজেন যেন এই যোগাযোগ। যোগাযোগ যত যথার্থ ও বেশি হবে সম্পর্ক তত মধুর ও মজবুত হবে। আর পারস্পরিক সুসম্পর্কই যেকোনো উন্নয়নের বুনিয়াদ। যোগাযোগের পরিমণ্ডলে থেকে আমরা যোগাযোগের উপর তেমন গুরুত্ব দেইনা। এ যেনো অনেকটা বাতাসের মধ্যে থেকে বাতাসকে উপলব্ধি না করা। তবে বর্তমান কোভিড-১৯ বাস্তবতা আমাদেরকে বুঝিয়ে দিচ্ছে মানব জীবনে যোগাযোগের গুরুত্ব কতটা ব্যাপক। আক্রান্ত ব্যক্তিরা কখনো কখনো বিচ্ছিন্ন দ্বীপবাসী হয়ে যান। তবে এমনও দেখা গেছে সংক্রমক জেনেও ডাক্তার-নার্সরা করোনা আক্রান্ত ব্যক্তিকে সেবা স্পর্শ দিয়ে এবং পরিবার ও আত্মীয়-স্বজনেরা প্রযুক্তির ফসল ফোনের মধ্যদিয়ে যোগাযোগ করে রোগিকে সুস্থতার দিকে নিয়ে গেছেন। তাই বলা যায়, মানব জীবনের বিকাশ, উৎকর্ষতা ও সুস্থতার জন্য যোগাযোগের বিকল্প নেই।

খ্রিস্টমণ্ডলী অনেক আগে থেকেই যোগাযোগের গুরুত্ব অনুভব করেছে এবং যোগাযোগ ধারণা বিস্তৃত করার জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়েছে। বিশ্ব যোগাযোগ দিবস পালন তন্মেধ্যে অন্যতম একটি উদ্যোগ। মাণ্ডলিক ঐতিহ্য অনুযায়ী প্রভু যিশুর স্বর্গারোহণ মহাপর্বের দিন বিশ্ব যোগাযোগ দিবস পালন করা হয়। এ বছর ১৬ মে তা পালিত হবে। যিশুর দেহধারণ ও স্বর্গারোহণের মধ্যদিয়ে ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে তথা স্বর্গ ও মর্ত্যের মধ্যে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হল। মানুষে-মানুষে সে যোগাযোগ যেনো যথার্থভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় তাই স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয় যোগাযোগ দিবসে। ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে পোপ ৬ষ্ঠ পল বিশ্ব যোগাযোগ দিবস পালন আনুষ্ঠানিকভাকে শুরু করেন। বিশ্ব যোগাযোগ দিবসে পোপ মহোদয় তার বাণীর মধ্যদিয়ে যোগাযোগকারীদের প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা ও পরামর্শ দান করেন। যাতে করে যোগাযোগকারীগণ সঠিক যোগাযোগ স্থাপনের মধ্যদিয়ে সকলের সাথে সু-সম্পর্ক সৃষ্টিতে উৎসাহিত ও উদ্যোগী হন। পোপ ফ্রান্সিস ২০২১ খ্রিস্টাব্দে ৫৫তম বিশ্ব যোগাযোগ দিবসের প্রতিপাদ্য রূপে বেছে নিয়েছেন - 'এসো, দেখে যাও: মানুষ যেখানে যে অবস্থায় আছে তার মুখোমুখী হয়ে যোগাযোগ করো'। এ বাণী রাখার মধ্যদিয়ে পোপ ফ্রান্সিস দ্ব্যর্থহীনভাবে আহ্বান করছেন মানব বাস্তবতাকে তুলে ধরার জন্য; মিডিয়া বা যোগাযোগ প্রযুক্তির বাস্তবতা ও বাহাদুরি নয়। মানব জীবনের দুঃখ-কষ্ট, হাসি-আনন্দ, সফলতা-ব্যর্থতায় মানুষের মুখোমুখি হয়ে তা তুলে ধরার আহ্বান রাখা হচ্ছে। অনেক সংবাদসেবী মানুষের জীবনের সাথে সম্পৃক্ত থেকে মানুষের বাস্তবতা তুলে ধরে পরস্পরের মধ্যে সম্পর্কের সেতু তৈরি করে যাচ্ছেন। সমাজ, দেশ ও মণ্ডলীর কঠিনতা ও দুর্বলতাগুলো প্রকাশ করার মধ্যদিয়ে সাহসিতকার পরিচয় দিয়ে সততার পথে পরিচালিত হতে সকলকে সহায়তা করছেন। আসলে মিডিয়ার শক্তিকে যথার্থভাবে মানবকল্যাণ, শান্তি ও সমৃদ্ধি অর্জনে কাজে লাগাতে পারলে এ জগতে ঐশরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হবে। আধুনিক তথ্য-প্রযুক্তির উন্নয়নে ও ব্যবহারে বিশ্বের মধ্যে আন্তর্জাতিকতা ও মানবতাবোধ বৃদ্ধি পেয়েছে। মিডিয়ার কল্যাণে পৃথিবীর এক দেশের উন্নয়নের ছোঁয়া অন্যদেশ জানতে পারছে ও উপকৃত হচ্ছে।

আমাদের দেশসহ পৃথিবীর অনেক দেশের কিছু মানুষ যোগাযোগ প্রযুক্তি ও মিডিয়াকে ব্যবসা হিসেবে গ্রহণ করেছেন। তাদের কাছে মিডিয়া অর্থ উপার্জনের অস্ত্র ছাড়া আর কিছু নয়। তাই তারা নিজ স্বার্থসিদ্ধি করার জন্য প্রতিদিন হাজারো নেতিবাচক ও মুখরোচক তথ্য দিয়ে যাচ্ছেন। অনেক ক্ষেত্রে মিডিয়া অতিরঞ্জন বা আংশিক সত্য প্রকাশ, মিথ্যাচার, প্ররোচনা, উস্কানিমূলক আচরণ, সরকারি বা কোন গোষ্ঠীর রাজনৈতিক প্রচার যন্ত্র, স্বার্থসিদ্ধির হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। যা ব্যক্তি, সমাজ ও দেশকে কলুষিত করে। এমনিতর অবস্থায় 'এসো, দেখে যাও : মানুষ যেখানে যে অবস্থায় আছে তার মুখোমুখী হয়ে যোগাযোগ করো' - আহ্বানটি সংবাদকর্মীদের জন্য একটি চ্যালেঞ্জ ও সত্যের পথে এগিয়ে চলার একটি দৃঢ় প্রত্যয়॥ †

যে বিশ্বাস করবে ও দীক্ষাস্নাত হবে, সে পরিত্রাণ পাবে ; যে বিশ্বাস করবে না, তাকে বিচারাধীন করা হবে।

- (মার্ক ১৬:১৬)

অনলাইনে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন : www.weekly.pratibeshi.org

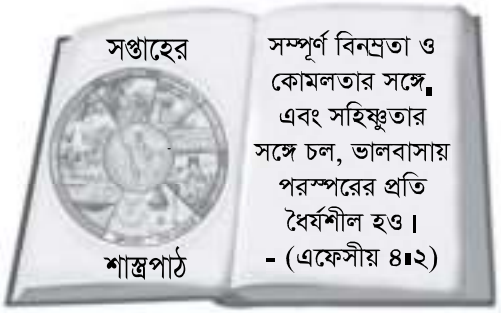

কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ ১৬ - ২২ মে, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

১৬ মে, রবিবার
প্রভু যীশুর স্বর্গারোহণ মহাপর্ব
শিষ্যচরিত ১: ১-১১, সাম ৪৭: ২-৩, ৬-৯, এফেসীয় ৪: ১-১৩; অথবা এফেসীয় ৪: ১, ১৭-২৩, মার্ক ১৬: ১৫-২০
বিশ্ব যোগাযোগ দিবস।

১৭ মে, সোমবার
শিষ্যচরিত ১৯: ১-৮, সাম ৬৮: ১-৬, যোহন ১৬: ২৯-৩৩

১৮ মে, মঙ্গলবার
সাধ্বী বার্থলোমেয়া কাপিতানিও, ভিনসেন্সা জেরোসা, সন্ন্যাসব্রতী-এর স্মরণ দিবস
শিষ্যচরিত ২০: ১৭-২৭, সাম ৬৮: ৯-১০, ১৯-২০, যোহন ১৭: ১-১১ক
অথবা: সাধু-সাধ্বীদের পর্বদিবসের বাণীবিতান:
প্রত্যাদেশ ১৯: ১, ৫-৯ক; অথবা কলসীয় ৩: ১২-১৭, সাম১৪৮: ১-২, ১১-১৪, মথি২৫: ৩১-৪০
সিষ্টারস্ অব চ্যারিটি সংঘের পর্ব।

১৯ মে, বুধবার
শিষ্যচরিত ২০: ২৮-৩৮, সাম ৬৮: ২৮-২৯, ৩২-৩৫গ, যোহন ১৭: ১১খ-১৯

২০ মে, বৃহস্পতিবার
শিষ্যচরিত ২২: ৩০; ২৩: ৬-১১, সাম ১১৬: ১-২, ৫, ৭-১১, যোহন ১৭: ২০-২৬

২১ মে, শুক্রবার
শিষ্যচরিত ২৫: ১৩-২১ সাম ১০৩: ১-২, ১১-১২, ১৯-২০, যোহন ২১: ১৫-১৯

২২ মে, শনিবার
শিষ্যচরিত ২৮: ১৬-২০, ৩০-৩১, সাম ১১: ৪, ৫, ৭, যোহন ২১: ২০-২৫

প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

১৬ মে, রবিবার
+ ১৯৮৯ সিস্টার এম. এডিথ আরএনডিএম (ঢাকা)
১৭ মে, সোমবার
+ ১৯৮৪ বিশপ রেমন্ড লারোজ সিএসসি (চট্টগ্রাম)
+ ১৯৯৩ ফাদার টমাস জিমারম্যান সিএসসি (ঢাকা)
১৮ মে, মঙ্গলবার
+ ১৯৮৩ সিস্টার এম. শার্লিটা এনরাইট সিএসসি
১৯ মে, বুধবার
+ ১৯৪৮ সিস্টার মেরী হেলেন এসএমআরএ
+ ১৯৭৫ ফাদার ওয়ালটার মার্কস সিএসসি (ঢাকা)
+ ২০২০ সিস্টার থিওনিলা আরাক্কাপারামবিল এসসি (ঢাকা)
২০ মে, বৃহস্পতিবার
+ ১৯৭৯ সিস্টার গাব্রিয়েল ফ্রেডারিক এসসি
+ ২০০৪ ফাদার লরেঞ্জো ফন্টিনী এসএক্স (খুলনা)
২১ মে, শুক্রবার
+ ১৯৬৯ ফাদার স্তেফান ডায়াস (ঢাকা)
+ ২০০৮ ব্রাদার জেমস এডওয়ার্ড গ্রীটম্যান সিএসসি
২২ মে, শনিবার
+ ১৯৯৪ সিস্টার ইম্মাকুলেটা এসএমআরএ (ঢাকা)

যত্ন করি প্রবীণদের

সম্প্রতি উত্তরায় একটি বৃদ্ধাশ্রমে পরিদর্শনের সময় ৩জন খ্রিস্টানের খোঁজ পাওয়া যায়, কিন্তু তারা পরিচয় দিতে চান না। কারণ এতে করে সন্তানদের মর্যাদাহানি হতে পারে। খোঁজ নিলে হয়তো বা এমন অনেক বৃদ্ধাশ্রমে খ্রিস্টান পাওয়া যাবে। যা আমাদের জন্য অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়। সন্তানকে মানুষ করার জন্য পিতা-মাতাগণ রক্ত পানি করে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে উপার্জন করেন। বড় হয়ে সেই সন্তান ভাল বেতনে চাকরি করে, বউ নিয়ে সুখে থাকে। উপেক্ষাই করে পিতা-মাতাকে ভরণ-পোষণের দায়িত্ব নিতে। এমনকি নেয় না কোন খোঁজ খবর। ধিক সেই সন্তানকে যে বলে তোমাদের জন্য যা কিছু করার ছিল তা সবই কুরবান হয়ে গেছে। বৃদ্ধ হলেই পিতা-মাতাগণ অনেক পরিবারে হয়ে যায় বোঝা। যত্ন না পেয়ে, পায় যাতনা। আবার অনেক সময় বউমার কাছ থেকে শুনতে হয় কটু কথা, আর ছেলের কাছ থেকে পায় অবজ্ঞা ও অবহেলা। সবই মুখ বুজে সহ্য করে থাকেন, যেন তাদের সন্তান বউ, ছেলেমেয়ে নিয়ে সুখেই থাকে। আগে দেখতাম শিশুদের শাসন করলে ঠাকুমা বা দাদুর কাছে গিয়ে লুকাতো। আর এখন শিশুদের শাসন করেলে বাথরুমে বা টয়লেটে গিয়ে লুকায়। শিশুরই কি বা দোষ, সে তো আর ঠাকুমা বা দাদুকে কাছে পায় না। অথচ প্রথম ক্রুশের চিহ্ন এবং বিভিন্ন প্রার্থনা ঠকুমা বা দাদুর কাছ থেকে শিখেছি।

কথায় বলে বয়োজ্যেষ্ঠরা নাকি পরিবারে ছাতার মতো। রৌদ, বৃষ্টি ঝড়ে ছাতার নিচে আশ্রয় নিয়ে আরাম বোধ করি, রক্ষা পায় অনাকাঙ্খিত বৃষ্টির হাত থেকে। আর বয়োজ্যেষ্ঠদের সান্নিধ্য লাভ করে বুঝতে পারি জীবনের অর্থ, লাভ করি জীবনিশক্তি, অনুভব করি পরম প্রশান্তি এবং থাকি নিরাপদে। তাদের উপদেশ, নির্দেশনা ও সহভাগিতা আমাদের জীবনে আশীর্বাদ স্বরূপ এবং এই জীবন পথে চলতে দিয়ে থাকেন সঠিক দিক নির্দেশনা। বাস্তব হলেও সত্য যে প্রচন্ড রৌর্দ্রে কিংবা আকাশে মেঘ দেখেও আমরা ছাতা নিয়ে চলি না। রৌদ্রে পোড়তে থাকবো, বৃষ্টি হলে ভিজে কোন ছাউনির নিচে দাঁড়িয়ে থাকবো ঠিকই কিন্তু ছাতা সঙ্গে নিয়ে চলবো না। কারণ ছাতা সঙ্গে রাখা মানে ঝামেলার বিষয় মনে করি। বর্তমানে অনেক পরিবারে প্রবীণদের শুধু ঝামেলাই মনে করে না, দেখা হয় বোঝা হিসেবে। অথচ ছাতা আমাদরে বিপদের বন্ধু আর প্রবীণেরা জীবন পথের পথ প্রদর্শক। আবার অন্ধকারে আলোকবর্তিকা।

আজ আমাদের জন্য অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে যে- অনেকে দাওয়াত রক্ষা করার সময় পায়, ঘুরে বেড়াতে সময় পায়, বউ নিয়ে চইনিজ খাওয়ার সময় পায় কিন্তু বৃদ্ধ পিতা-মাতাকে দেখার সময় হয়ে উঠে না। ঘন্টার পর ঘন্টা মোবাইলে সময় দিতে পারে, আড্ডা দিতে পারে কিন্তু বৃদ্ধ পিতা মাতাকে সময় দিতে পারে না। কিছু জিজ্ঞেস করলে বা কিছু বলতে চাইলে, উত্তর আসে অনেক ব্যস্ত, সময় নাই, পড়ে শুনবো।

বৃদ্ধ পিতা মাতার ভরণ-পোষণ, অসুস্থ হলে দেখাশুনা করা, আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। তাদের স্নেহ ভালবাসায় নবীনরা যেমন বেড়ে উঠে, তেমনি প্রবীণেরা অতিবাহিত করে আনন্দপূর্ণ সময়। সোনা যেমন অতি পুরাতন হলেও কোন ভাবেই কমে যায় না এর মূল্য বা মাহাত্ম্য। তেমনি প্রবীণেরা পরিবারে মূল্যবান অভিভাবক ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন পথ প্রদর্শক। আসুন আমরা আমাদের পরিবারে প্রবীণদের যত্ন নেই, সময় দেয় তাদের সাথে। আলাপ করি পরিবারের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে, তা হলেই হয়ে উঠবে সুখি ও আদর্শ খ্রিস্টীয় পরিবার।

সনি রোজারিও
বনানী, ঢাকা।

৫৫তম বিশ্ব সামাজিক যোগাযোগ দিবস উপলক্ষে পোপ ফ্রান্সিসের বাণী- ২০২১

এসো দেখে যাও (যোহন ১:৪৬)

মানুষ যেখানে যে অবস্থায় আছে তার মুখোমুখি হয়ে যোগাযোগ করো।

প্রিয় ভাই এবং বোনেরা,

"এসো দেখে যাও" যিশুর এই আমন্ত্রণ ছিলো শিষ্যদের সাথে তাঁর প্রথম মুখোমুখি সাক্ষাত, যা হতে পারে মানুষের মধ্যে সর্বপ্রকার যোগাযোগের একটি সর্বসিদ্ধ পদ্ধতি। জীবনের সত্য বলার প্রচলিত ঐতিহাসিক ধারণা ও মনোভাব হলো, আমরা "ইতোমধ্যে জানি" আমাদের এই আত্মতুষ্টির উর্ধ্বে উঠতে হবে। আমাদের যেতে হবে, দেখতে হবে, তাদের সাথে সময় অতিবাহিত করতে হবে, তাদের গল্প শুনতে হবে, তাদের বাস্তবতার মুখোমুখি হতে হবে- যেগুলো কোনো না কোনোভাবে আমাদের আশ্চর্যান্বিত করবে। মানুয়েল লোজানো গারিদোতাঁর সাংবাদিকদের যা বলেছিলেন, তার উদ্বৃতি দিয়ে পোপ বলেন, "চক্ষু খোলো এবং বিস্ময় নিয়ে দেখো, তোমাদের হস্ত নির্মল ও বাস্তবতাকে স্পর্শ করুক- যেনো তুমি যা লিখেছো অন্যে সেগুলো পড়ে এবং তারাও যেনো প্রথমবারের মতো জীবনের রোমাঞ্চকর অলৌকিক বিষয় জানতে পারেন।" পোপ ফ্রান্সিস বলেন, এই আমন্ত্রণ বার্তার আলোকে সকলকে বলতে চাই, "এসো এবং দেখো" যা হতে পারে সর্বপ্রকার যোগাযোগের জন্য অনুপ্রেরণা; কারণ- প্রকাশনা, ইন্টারনেট, চার্চের দৈনন্দিন শিক্ষা, রাজনীতি যেগুলো সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে শুদ্ধ ও সত্য হওয়ার জন্য সংগ্রাম করছে। "এসো এবং দেখো' হলো সব সময়ের জন্য মণ্ডলীর একটা বিশ্বাসের পথ, ঠিক সেই রকম যখন প্রথম জর্ডান নদী এবং গালিল সাগরের তীরে প্রথম মুখোমুখি যোগাযোগের ঘটনা ঘটেছিলো।

অলি গলিতে সোচ্চার হওয়া : এবার দেখা যাক বার্তা সম্পাদনার প্রধান শিরোনাম। প্রচলিত একটি ধারণা হলো, খবরের কাগজ, রেডিও, টেলিভিশনে অনুসন্ধানমূলক প্রতিবেদন তুলে ধরার ঝুঁকির কারণে মানসই প্রতিবেদনের পরিবর্তে গুঢ় উদ্দেশ্যসম্পন্ন ও ব্যাখ্যামূলক প্রতিবেদন উঠে আসছে। এই প্রবণতা তৃণমূল পর্যায়ে জীবনের আসল বাস্তবতা, সত্যতা ও ইতিবাচক সামাজিকতা প্রকাশ করে না। প্রকাশনা সংস্থার এই সঙ্কট, যা বার্তাকক্ষে, ব্যক্তির দ্বারা অথবা প্রতিষ্ঠানের অক্ষর বিন্যাসকক্ষে চিত্রায়িত হচ্ছে- তা অলিতে গলিতে থাকা মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা, গল্পের অনুসন্ধান নয় এবং তা বাস্তবতার প্রাথমিক চিত্রও নয়। সুতরাং আমরা যদি প্রযুক্তিগত এতো উৎকর্ষতা ও সক্ষমতার পরেও আসল কাহিনীর প্রতি আমাদের নজর উন্মুক্ত না করি, তাহলে শুধুমাত্র দর্শকই হয়ে থাকবো। প্রযুক্তি আর যন্ত্রের উন্নতমান তখনই মূল্যবান হয়ে ওঠে, যখন তা আমাদের আকৃষ্ট ক'রে বেরিয়ে এসে, যা আমরা জানি না বা অন্যত্র প্রকাশিত হয়নি- তার মুখোমুখি হই। নতুবা অন্যভাবে তা সম্ভব নয়।

বার্তার গল্প হিসেবে মঙ্গলসমাচার : জর্ডান নদীতে যিশুর দীক্ষাস্নানের পরে, তাঁর প্রতি সন্দিহান শিষ্যদের তিনি প্রথম যা বললেন, তা হলো, "এসো দেখে যাও," তাই তারা গেলেন। তারা গিয়ে দেখলেন তিনি কোথায় থাকেন; এবং তারা সেই দিনের বাকি সময়টা তাঁর সঙ্গেই কাটালেন *(যোহন ১:৩৯)*।" যিশু তাদের আমন্ত্রণ জানালেন- যেনো তাঁর সঙ্গে একটা সম্পর্ক গড়ে ওঠে। প্রায় অর্ধ শতাব্দি পরে যোহন যখন মঙ্গলসমাচার লিখেন এবং তার সু-সংবাদ লেখনী প্রমাণ করতে সাহায্য করে যে, তিনি তখন স্ব-শরীরে উপস্থিত থেকে তা দেখেছেন, যা তার জীবনকেও প্রবলভাবে প্রভাবিত করেছিলো। এটা আমাদের বুঝতে সাহায্য করে যখন তিনি বলেন, "তখন প্রায় বিকেল চারটে।" যোহন আমাদের বলেন যে, পরদিন ফিলিপ নাথানায়েলকে বললেন যে, তিনি মশীহের দেখা পেয়েছেন। কিন্তু নাথানায়েল সন্দিহান হয়ে বললেন, "নাজারেথ ! সেখান থেকে ভালো কিছু কখনো কি আসতে পারে ?" ফিলিপ কিন্তু যুক্তি-তর্ক দিয়ে জয়ী না হওয়ার চেয়ে শুধু তাকে বললেন, "এসো দেখে যাও।" নাথানায়েল গেলেন এবং দেখলেন এবং সেই মুহূর্ত থেকে তার জীবনেও পরিবর্তন আসলো। এটাই হলো খ্রিস্টীয় বিশ্বাসের সূচনা, এটাই হলো প্রকৃত যোগাযোগ, প্রত্যক্ষ জ্ঞান- যার জন্ম হয় বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে- কোনো শোনা কথা থেকে নয়। সামারীয় নারীর কাহিনীতেও মশীহ সম্পর্কে এই ভাবে সাক্ষ্য দেওয়া হয়েছিলো, "এখন আমরা যে বিশ্বাস করি, তা যে আর তোমার কথা শুনেই, তা নয়। আমরা তো নিজেরাই তাঁর বাণী শুনেছি, আর এখন আমরা জানি যে, তিনি সত্যিই জগতের ত্রাণকর্তা *(যোহন ৪:৪২)*।" তার আগে মেয়েটি মশীহের সাক্ষাৎ পাওয়ার পর শহরবাসীকে বললেন, "এসো তোমরা, দেখে যাও একজনকে, জীবনে আমি যা-কিছু করেছি, তিনি তা সবই আমাকে ব'লে দিয়েছেন। তাহলে তিনি কি সেই খ্রিস্ট নন *(যোহন ৪:২৯)*।" পোপ বলেন, "এসো দেখে যাও" হলো বাস্তবকে জানার একটি সহজ উপায়, আর এই সাক্ষ্যবাণীগুলো হলো তার বাস্তব প্রমাণ। কারণ, জানতে হলে আমাদের মুখোমুখি হতে হয়- সামনা-সামনি শুনতে হয়- যেনো তার সাক্ষ্যবাণীর মধ্যে পৌঁছাতে পারি।"

সাংবাদিকদের সাহসিকতার জন্য ধন্যবাদ : সাংবাদিকতা হলো যৌক্তিক বাস্তবতা- এবং একজন তার মনোবল বলে এমন সব স্থানে ভ্রমণ করেন, যেখানে অন্য কেউ যাওয়ার চিন্তাও করেন না। সাংবাদিকগণ দেখা সাক্ষাৎ, ঔৎসুকতা, খোলাখুলি মন ও তাগিদের কারণে যাওয়ার জন্য তৈরি থাকেন। সাংবাদিক, ছবি গ্রাহক, সম্পাদক ও পরিচালকদের পেশাদারি মনোভাব ও জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কাজের যে সাহসিকতা- তার জন্য আমরা কৃতজ্ঞ। তাদের কঠোর পরিশ্রমের কারণে আমরা বিশ্বের অনেকাংশে সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন, দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ওপর অন্যায্যতা ও তাদের পরিবেশ, যুদ্ধ-সংঘাত সম্পর্কে জানতে পারছি- নতুবা এই জানা সম্ভব হতো না। তাদের এই পরিশ্রমের জন্য ধন্যবাদ। তাদের এই পরিশ্রমটা শুধু খবর পরিবেশনা নয়, কিন্তু তাদের পরিশ্রম ও ঝুঁকি ছাড়া সমাজ, বৃহদাকারে গণতন্ত্রের কণ্ঠও নীরব হয়ে যেতো। এমনকি

আমাদের গোটা মানব পরিবারের সদ্‌গুণাবলীও লুপ্ত থেকে যেতো। আমাদের আজকের বিশ্বের অবস্থা, বিশেষ করে এই মহামারি গণমাধ্যমকে স্বাগত জানাচ্ছে, "এসো দেখে যাও" বলে। অন্যথায় আজকের এই মহামারি ও বিরাজমান অন্যান্য সংকটগুলো শুধু মাত্র বিশ্বের উন্নত জাতির নিজস্ব আলোক চিত্রের মধ্যদিয়ে জানতে হতো। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় এবং প্রশ্নটি হলো মহামারির ভ্যাকসিন বিষয়ক ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর চিকিৎসা সহায়তা থেকে বঞ্চিত থাকার বিষয়টি। আমাদের আর কে-ই বা জানাতেন বিশ্বের দরিদ্র পীড়িত অঞ্চলগুলোর হতভাগাদের চিকিৎসার জন্য দীর্ঘ সময় অপেক্ষায় থাকার পালার কথা। বিশ্বে স্বাস্থ্যসেবার নীতি নিশ্চিত করার অঙ্গীকার থাকলেও আসল বাস্তবতা হলো- সাম্রাজ্যবাদ এবং অর্থনৈতিক অসমতার কারণে কোভিড-১৯ নির্মূল ভ্যাকসিন সরবরাহে দরিদ্র জনগোষ্ঠী রেখার প্রান্ত সীমায় অবস্থান করছেন। এমনকি এই সম্ভাবনাময় বিশ্বে শোকাহত বহু পরিবার খুব দ্রুত এবং অজানা থেকে, সাহায্য সংস্থার কাছে লজ্জিত হওয়ার অপেক্ষা না করে দারিদ্রসীমায় নেমে যাচ্ছেন- যেগুলো হয়তোবা খবরের শিরোনামে আসতো না।

ইন্টারনেট সংস্কৃতির সুবিধা ও গোপন বিপদসমূহ : আজকের ইন্টারনেট জগতের বহুমুখিতার কারণে গণমাধ্যমের উপস্থাপনায় বিশ্বজুড়ে বহু রকমের দৃষ্টিকোণ থেকে চিত্র-প্রতিচ্ছবি, সাক্ষ্যদানসহ নানা বিষয়ের কারণে, সংবাদ পরিবেশনা ও সহযোগিতা বৃদ্ধি লাভ করেছে। আজকের ডিজিটাল প্রযুক্তির কারণে সময় মতো এবং প্রত্যক্ষসূত্রে প্রাপ্ত পর্যায়ের তথ্য প্রবাহ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। আমরা চিন্তা করতে পারি- জরুরি কোনো অবস্থাকালে প্রত্যক্ষ সূত্রে প্রাপ্ত সংবাদ বা সরকারি কোন প্রজ্ঞাপন ইন্টারনেটের মাধ্যমে কতো সহজে প্রচার করা যায়। এটা আসলেই একটা শক্তিশালী প্রযুক্তি, যা অবশ্যই ব্যবহারকারী এবং ভোক্তাকে দায়িত্বের সাথে ব্যবহারের দাবি রাখে। প্রাচীন পদ্ধতিতে অনেক কিছুই এড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ থাকে কিন্তু আজকের এই শক্তিশালী মাধ্যমের কল্যাণে সমাজ অনেক গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল। ঘটনার ও ইতিবাচক সংবাদের প্রত্যক্ষ সাক্ষী হতে পারে। ইন্টারনেটের বদৌলতে আমাদের সামনে যা ঘটে তা অন্যের সঙ্গে সহভাগিতা করতে পারি। অন্যদিকে এবং একই সময়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভুল তথ্য ছড়িয়ে পড়ার ঝুঁকি ও আশংকাও থেকে যায়। আমরা ইতোমধ্যেই জেনেছি যে, মাঝে মধ্যে উদ্দেশ্য প্রণোদিত বা হীনমন্যতা নিয়ে সংবাদ এবং চিত্র-প্রতিচ্ছবি বদলে দেওয়া হয়। এতে ইন্টারনেটকে খাটো করে না দেখে বস্তুনিষ্ঠভাবে বিষয়বস্তু প্রচার এবং গ্রহণে সত্যতা ও দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিতে হবে। আমরা যে যোগাযোগের ক্ষেত্রসমূহ তৈরি করি, যেসব তথ্য প্রচার করি, সেখানে জাল তথ্য নিয়ন্ত্রণ করার প্রচেষ্টায় দায়িত্বশীল থাকতে হবে। আমাদের সবাইকে, দেখা এবং সহভাগিতার ক্ষেত্রে সত্যের সাক্ষ্য বহন করতে হবে।

প্রত্যক্ষসূত্রে দেখার বিকল্প কিছু নেই : যোগাযোগ মাধ্যমে ব্যক্তির নিজ চোখে কিছু দেখার শতভাগ কোনো বিকল্প নেই। প্রত্যক্ষসুত্রে প্রাপ্ত অভিজ্ঞতা থেকেই মাত্র আমরা শিখতে পারি। আমরা শুধুমাত্র বাক্য দিয়ে নয়- বরং সেই সাথে আমাদের চোখের ইশারা, কণ্ঠস্বর এবং আকার-ইঙ্গিতের মধ্যদিয়েও যোগাযোগ স্থাপন করি। যিশুর সঙ্গে যাদের সাক্ষাৎ হতো, তারা আকৃষ্ট হতেন তাঁর সত্য প্রচারের কারণে। অন্যের দিকে তাঁর অবলোকন, অন্যের সঙ্গে তাঁর ভিন্ন-ভিন্ন আচরণ, এমনকি তাঁর নিরবতার মধ্যেও শিক্ষার অবিচ্ছেদ্যরূপ ছিলো। শিষ্যগণ শুধু যিশুর বাণীই শুনতেন না- দেখতেন তিনি কিভাবে বলেন এবং মানব দেহধারণকারী পুত্রের মুখে উচ্চারিত বাণীর মধ্যে কিভাবে অদৃশ্য পিতাকে শুনতে পেতেন এবং স্পর্শ করতেন। যোহনের ১ম ধর্মপত্রে যেমনটি বলা হয়েছে, "যা আদি থেকেই ছিল, আমরা যা শুনেছি, নিজেদের চোখেই যা দেখেছি, দু'চোখ ভরেই দেখেছি, আমাদের হাত যা স্পর্শ করেছে, সেই জীবনস্বরূপ স্বয়ং বাণীর কথাই এখন বলছি। সেই জীবন তো সত্যিই প্রকাশিত হয়েছে। আমরা তা দেখেছি আর সে বিষয়ে সাক্ষিও দিচ্ছি। যে শ্বাশত জীবন পরম পিতার কাছেই ছিল আর আমাদের সামনে যা প্রকাশিত হয়েছে, সেই জীবনের কথাই এখন তোমাদের জানাচ্ছি। আমরা নিজেরা যা দেখেছি আর যা শুনেছি, তা তোমাদের জানাচ্ছি, যাতে আমাদের সঙ্গে তোমরাও সেই মিলন বন্ধনে মিলিত হতে পার, যে মিলন বন্ধনে পরম পিতার সঙ্গে এবং তাঁর পুত্র যিশু খ্রিস্টের সঙ্গে আমরা নিজেরাই মিলিত হয়ে আছি *(১:১-৩)*।" বাণী তখনই কার্যকর হয়ে উঠে যদি তা "দেখে" অভিজ্ঞতা ও সংলাপের সঙ্গে যুক্ত করে তোলে। এই কারণেই "এসো দেখে যাও" এই আমন্ত্রণ বয়ে নিয়ে চলা অপরিহার্য।

আমরা চিন্তা করে দেখি- আমাদের চর্তুদিকে, যেমনি জনজীবনের সর্বত্র, তেমনি ব্যবসা-বাণিজ্য ক্ষেত্রে এবং রাজনীতিতেও সারশূন্য কথার কতো চমৎকারিত্ব। "এটা অথবা সেটা," এইসব কথার মারপ্যাচ শুধু বৃথার সঙ্গে অশেষ কারবার ছাড়া আর কিছুই নয়। কারণ হিসেবে বলা যায় যে, গমের দু'টি দানার খোসা মাপযন্ত্রের পাল্লার মধ্যে লুকিয়ে থাকা, যা তুমি আগেই দিনভর খুঁজছো, আর যখন পেলে, তখন দেখলে তোমার খোঁজা-খুঁজি সবই বৃথা। বাইবেলের মঙ্গলবার্তা গোটা বিশ্ব জুড়েই বিস্তার লাভ করেছে। ফলস্বরূপ-নারী এবং পুরুষ সকলেই ব্যক্তি থেকে ব্যক্তিতে, হৃদয় থেকে হৃদয়ে, উন্মুক্তভাবে এই "এসো এবং দেখে যাও" আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন, তারাই তাদের দৃষ্টি-ভঙ্গী, কথা-বার্তা ও আকার-ইঙ্গিত দিয়ে মানবতার জন্য খ্রিস্টের সাক্ষ্য বহন করছেন। প্রতিটি যন্ত্রেরই তার নিজের মূল্য রয়েছে- তবে এটা ব্যবহারকারীর বিশ্বাস, আশা এবং স্বেচ্ছাদান, যার মধ্যদিয়ে তিনি তার সমসাময়িকদের উৎসাহিত করে থাকেন। সাধু আগষ্টিন বলেছেন, "আমাদের হাতে রয়েছে গ্রন্থ, আর চোখের সামনে ঘটনা" আর সেই গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে প্রাবক্তিক বাণী পূর্ণ করার অঙ্গীকার। সুতরাং মঙ্গলসমাচার আমাদের দৈনন্দিন জীবনে বাস্তব হয়ে ওঠে- যখন আমরা মানুষের সাক্ষ্যদান গ্রহণ করি, যাদের জীবন যিশুর সাথে মুখোমুখি হওয়ার দরুণ রূপান্তরিত হয়ে ওঠেছে। গত দুই হাজার বছর ধরে যিশুর সম্মুখ মুখোমুখি হওয়ার এই উন্মুক্ত শিকল বেড়ি খ্রিস্টীয় অগ্রযাত্রায় যোগাযোগ স্থাপন করে চলেছে। তারপরও বলতে হয়, মানুষ যেখানে যে অবস্থাতেই থাকুক না কেনো, তাদের মুখোমুখি হয়ে যোগাযোগ রক্ষা করার আমন্ত্রণ আমাদের জন্য থাকবেই।

গণমাধ্যম কর্মীদের প্রার্থনা : হে প্রভু, আমাদের শিক্ষা দাও নিজের ঊর্ধ্বে উঠে সত্যের অন্বেষণে নিজেকে নিয়োজিত করতে। প্রত্যক্ষ করার জন্য বের হতে শিক্ষা দাও, শুনতে শিক্ষা দাও। আমরা যেনো পক্ষপাতদুষ্টে প্রীত না হই বা অনর্থ সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করি। যেখানে কেউ যেতে ইচ্ছুক নয় আমাদের যেতে শিক্ষা দাও। আমরা যেনো সময় নিয়ে বুঝতে পারি এবং প্রয়োজনের নিমিত্তে মনোযোগ দিতে পারি। যেনো আতিশয্যায় বিভ্রান্ত না হই। যেনো ছলনা দৃষ্টির বদলে সত্যকে চিহ্নিত করতে পারি। আমাদের অনুগ্রহ দান করো, যেনো বিশ্বে তোমার অবস্থান নির্ণয় করতে পারি এবং যেন যা দেখি তা সততার সাথে অন্যকে জানাতে পারি।

পোপ ফ্রান্সিস

রোম, সাধু যোহনের লাতেরান মহামন্দির

২৩ জানুয়ারি ২০২১, সাধু ফ্রান্সিস সেলস্‌ের স্মরণ দিবস

ভাষান্তর : ফাদার সুনীল ডানিয়েল রোজারিও

বিশ্ব যোগাযোগ দিবসের কথা

ফাদার সুনীল রোজারিও

ভূমিকা : কাথলিক চার্চ প্রতিবছর পঞ্চাশত্তমী রবিবারের আগের রবিবার বিশ্ব যোগাযোগ দিবস পালন করে থাকে। আবার এদিনই খ্রিস্টমণ্ডলীতে পালিত হয় প্রভু যিশুর স্বর্গারোহণ মহাপর্ব। আজকের মঙ্গলসমাচার পাঠের মূল বাক্য হলো, "তোমরা জগতের সর্বত্রই যাও, বিশ্ববাসীর কাছে তোমরা ঘোষণা কর মঙ্গলসমাচার *(মার্ক ১৬:১৫)*।" এই দিবসটি পালন উপলক্ষে ঘোষণা পত্রে বলা হয়েছে, "মণ্ডলীতে যোগাযোগ মাধ্যমের উত্তরণ হলো, এর যথার্থ ব্যবহার করে বাইবেলের মূল্যবোধ প্রকাশ করা।" এই লক্ষ্য নিয়েই প্রতি বছর পোপ মঙ্গলসমাচারের আলোকে বিশেষ বাণী দিয়ে থাকেন।

ইতিহাস:দ্বিতীয় ভাতিকান মহাসভার পর পরই পোপ ৬ষ্ঠ পল কাথলিক চার্চে বিশ্ব সামাজিক যোগাযোগ দিবস পালনের ঘোষণা দেন এবং ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দের ৭ মে রবিবার প্রথম বিশ্ব মণ্ডলীতে বিশ্ব সামাজিক যোগাযোগ দিবস পালিত হয়। এই ঐতিহাসিক দিবসে পোপ ৬ষ্ঠ পলের বাণী ছিলো, "চার্চ এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম।" পোপ অনুধাবন করতে পেরেছিলেন যে, চার্চকে প্রকৃতপক্ষে আধুনিক জগতের সঙ্গে যুক্ত হতে হবে। পোপ ৬ষ্ঠ পল- দ্বিতীয় ভাতিকান মহাসভা চলাকালীন সময়ে-পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা প্রতিনিধিদের ভাষা থেকে বুঝতে পেরেছিলেন যে, আধুনিক মানব সভ্যতা ও তার ইতিহাসের অংশ থেকে চার্চ আলাদা নয় এবং সেই সাথে এটাও বুঝেছিলেন যে, আধুনিক গণমাধ্যমের শক্তিশালী প্রভাব সমাজ-সংস্কৃতিতে পরিবর্তন আনতে সক্ষম। পরবর্তীকালে পোপগণ, প্রতি বছরই দিবসটি উপলক্ষে বিশেষ বাণী দিয়ে আসছেন এবং সেই সাথে গণমাধ্যমের মন্দ প্রভাবগুলো চিহ্নিত করে খ্রিস্টের বাণীপ্রচারের আহ্বান জানিয়ে আসছেন। দ্বিতীয় ভাতিকান মহাসভার, 'বর্তমান জগতে খ্রিস্টমণ্ডলী বিষয়ক পালকীয় সংবিধান' দলিলে বলা হয়েছে- আধুনিক জগতে খ্রিস্টমণ্ডলী, আশা ও আনন্দ, হতাশা ও মনকষ্ট, বিশেষ করে যারা নানা কারণে দরিদ্র ও দুঃখ-যন্ত্রণাভোগ করছেন, তা সত্ত্বেও, তাদের আশা বা আনন্দ হতাশা ও মনঃকষ্ট নিয়েই তারা খ্রিস্টের অনুসারী।" তাই মহাসভা মনে করছেন, এসবের মধ্যেই গণমাধ্যমকে পুরোপুরিভাবে নিয়োজিত হতে হবে। পোপ ২য় জন পল যেমন বলেছিলেন, বিশ্ব যোগাযোগ ব্যবস্থা হলো আধুনিককালের একটি ব্যবস্থাপনা, যা গোটা মানবজাতিকে একত্রিত ক'রে একটা বিশ্বপল্লীতে রূপান্তরিত করতে পারে। আজকের গণমাধ্যম ও

যোগাযোগ ব্যবস্থা- তথ্য-প্রযুক্তি, শিক্ষাব্যবস্থাসহ নানা বিষয় মানুষের ব্যক্তিগত জীবন, পারিবারিক জীবন ও সামাজিক বৈশিষ্ট্যসমূহে নিদের্শনা প্রদান করছে। পোপ ২য় জন পল, বিশেষ করে আধুনিক যুগের যুবসমাজকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন, "আজকের যুবসমাজ এমন একটি সময়ে বেড়ে উঠছে যখন বিশ্বটা গণমাধ্যম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।"

৫৫তম বিশ্ব যোগাযোগ দিবসের পটভূমি : পোপ ফ্রান্সিস, ৫৫তম বিশ্ব সামাজিক যোগাযাগ দিবসের বাণী গণমাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। পোপ তাঁর বাণীর ভূমিকাতেই বলার চেষ্টা করেছেন এই বলে যে, "যোগাযোগ হলো- মানুষ যেখানে যে অবস্থায় আছেন- তার মুখোমুখি হওয়া।" তিনি এই ধারণাটি নিয়েছেন যোহন রচিত মঙ্গলসমাচারে বর্ণিত ১:৪৬ পদ থেকে। "... তখন ফিলিপ বললেন, আহা, এসো না, একবার দেখেই যাও না।" তার বাণীর সারকথা হলো, যোগাযোগ করো- যে যেখানে-সেখানে সেভাবেই মুখোমুখি হও।" পোপ ফ্রান্সিস তাঁর বাণীর উপশিরোনামে উল্লেখ করেছেন, "পরদিন যিশু গালিলেয়ায় যাবেন ব'লে ঠিক করেছেন। এখানেই ফিলিপের সঙ্গে তাঁর প্রথম দেখা হয়। তিনি তাঁকে বললেন, 'তুমি আমার সঙ্গে চল।' এই ফিলিপ ছিলেন আন্দ্রিয় ও পিতরের মতোই বেথসাইদা শহরের লোক। তিনি তখন গিয়ে নাথানায়েলের সঙ্গে দেখা করলেন। তাঁকে বললেন, 'যাঁর কথা মোশী বিধানগ্রন্থে লিখে গেছেন- আবার প্রবক্তারাও যাঁর কথা লিখে গেছেন- সেই তাঁরই দেখা পেয়েছি আমরা। তিনি যোসেফের ছেলে যিশু, তিনি নাজারেথের লোক।' নাথানায়েল উত্তরে বললেন, 'নাজারেথের! সেখান থেকে ভাল-কিছু কখনো কি আসতে পারে ?' তখন ফিলিপ বললেন, 'আহা, এসো না, একবার দেখেই যাও না *(যোহন ১:৪৩-৪৬)*?"

পোপ ফ্রান্সিস তাঁর মূল বাণী ঘোষণার পূর্বে বিশ্বের বর্তমান মহামারি সম্পর্কে বলেন, "সময়ের যে পরিবর্তন আমরা অভিজ্ঞতা করছি, যে সময়ে আমরা মহামারির কারণে সামাজিক দূরত্ব মানতে বাধ্য হচ্ছি, তখন এই যোগাযোগ ব্যবস্থা আমাদের প্রয়োজনগুলোর সঙ্গে যুক্ত করতে এবং বিষয় সম্পর্কে সত্যিকার অর্থ খুঁজে বের করতে সহায়তা দিতে পারে।" তিনি বলেন, "অভিজ্ঞতা ছাড়া সত্যকে জানা সম্ভব নয়। মানুষের আনন্দ ও বেদনার সঙ্গে সহভাগিতা করতে না পারলে মানুষকে জানাও সম্ভব নয়। আমরা যেখানে- সেখানেই ঈশ্বর আমাদের সাক্ষাৎ করেন এবং এটাই হতে পারে চার্চের যোগাযোগ ব্যবস্থাপত্র। যিশু যেমন তাঁর শিষ্যকে অনুসরণ করতে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন, ঠিক তেমনি- আজকের গণমাধ্যমের জন্য একটা আমন্ত্রণ হলো, মানুষ যেখানে যে অবস্থায় আছে সেখানে সে অবস্থায় তাদের মুখোমুখি হওয়া।"

স্বর্গ লাভের প্রত্যাশা

ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

ছোটবেলায় ধর্মশিক্ষা ক্লাশে আমাদেরকে স্বর্গ সম্বন্ধে কিছুটা ধারণা দেওয়া হতো। ধর্মশিক্ষকেরা নিজ জ্ঞান ও বিশ্বাস থেকে বলতেন স্বর্গ হচ্ছে শান্তি-আনন্দের স্থান যেখানে ঈশ্বর বাস করেন। সেখানে কোন দুঃখ-কষ্ট, বেদনা, মনোমালিন্য, রাগারাগি নেই। যারা সেখানে থাকে তারা সর্বদা ঈশ্বর বন্দনায় মুখরিত থাকে। তারা দিন-রাত ঈশ্বরের প্রশংসা গান করে। তাদের কোন ক্লান্তি নেই। আছে হাসিখুশী আর প্রাণোচ্ছল ভাব। ঐ সময়েই শিক্ষকেরা বলতেন, চোখ বন্ধ করে স্বর্গের সেই দৃশ্য দেখতো যেখানে ঈশ্বর আছেন, যিশু আছেন, স্বর্গদূতেরা গান করছেন, সাধু-সাধ্বীরা শান্ত-স্নিগ্ধভাবে তাকিয়ে আছেন ঈশ্বরের দিকে। তারা আবার বলতেন, দেখতো তোমাদের পরিচিতমুখ সেখানে আছে কিনা, এই স্বর্গীয় দৃশ্যে তুমি কি নিজেকে দেখতে পাও? আমাদের কচিমনে আমরা স্বর্গের মনোমুগ্ধকর দৃশ্য মেনে নিলেও সেখানে পরিচিতমুখ বা নিজেকে আবিষ্কার করতে পারিনি। তথাপি ঐসময়েই আমাদেরকে শিক্ষা দেওয়া হয়-আমরা একদিন স্বর্গে যেতে পারবো। আমাদের সৃষ্টি ও এ জগতে প্রেরণের উদ্দেশ্য বলতে গিয়ে বলা হতো - ঈশ্বর আমাদেরকে এ জগতে প্রেরণ করেছেন যেন আমরা তাঁকে জানি, মানি এবং মৃত্যুর পরে স্বর্গে তাঁর সঙ্গে অনন্ত সুখে বসবাস করি। স্বর্গ লাভের প্রত্যাশা সেই শিশুমনেই রোপণ করে দেওয়া হয়; যেন পরবর্তী সময়ে ঈশ্বরের ইচ্ছা মেনে ও ভালো কাজ করে স্বর্গের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে পারি।

একেশ্বরবাদী তিনটি মূলধর্ম - ইহুদী, খ্রিস্টান ও ইসলামে স্বর্গ সম্বন্ধে ধারণা স্পষ্ট। স্বর্গ ঈশ্বরের আবাসস্থল, ঊর্ধ্বতম ও পবিত্রতমস্থান। হিব্রু বাইবেল অনুযায়ী বিশ্বমণ্ডল দু'ভাগে বিভক্ত; স্বর্গ ও পৃথিবী। স্বর্গ একটি স্থান যেখানে মানবকূল নিজেরা প্রবেশ করতে পারে না। মানবের ঊর্ধ্বে এর অবস্থান। মানবকূল পৃথিবীতেই থাকে; কিন্তু ঈশ্বরের সহায়তায় কেউ-কেউ স্বর্গের দৃশ্য পৃথিবীতে থেকেই দেখতে পায় এবং অল্প কিছু মানুষ সশরীরে স্বর্গে যায় (প্রবক্তা এলিয়)। তাদের কাছে স্বর্গ অনেকটা দূরের স্থান, ঈশ্বরের দেখা পাওয়া ভয়ের বিষয় ছিল। কিন্তু খ্রিস্টানদের কাছে স্বর্গ শুধু কোন স্থান নয় কিন্তু একটি অবস্থা। ঈশ্বরময় একটি অবস্থা। যেখানে ঈশ্বর উপস্থিত সেখানেই স্বর্গ বিদ্যমান। তাইতো সাধু মথি তাঁর মঙ্গলসমাচারে বেশ অনেকবারই স্বর্গরাজ্য ও ঐশরাজ্য শব্দ দুইটিকে সমার্থকভাবে ব্যবহার করেছেন। যে ঐশরাজ্যের কথা বিস্তার করতে যিশু এ জগতে এসেছিলেন এবং তাঁর ভালোবাসার বাণী ও কাজের মধ্যদিয়ে ঐশরাজ্য এ জগতে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

মানবদেহ ধারণ করে এ জগতে কুমারী মারীয়ার গর্ভে যিশুর আগমন, তাঁর প্রচার, মৃত্যু ও পুনরুত্থান ঐতিহাসিক সত্য ঘটনা; যা ঘটেছিল নির্দিষ্ট একটি সময়ে প্যালেস্টাইনের ইহূদী সমাজের কৃষ্টি-সংস্কৃতিতে। ঠিক একইভাবে যিশুর স্বর্গারোহণও একটি ঐতিহাসিক ঘটনা; যা ঘটেছিল যিশুর পুনরুত্থানের ৪০দিন পরে জেরুজালেমের পাশে বেথানিয়াতে ইহূদী জাতিগোষ্ঠীর কয়েকজন যিশু বিশ্বাসীর সামনে। ইহূদী বিশ্বাস ও দৃষ্টিভঙ্গি ছিল মানুষ ঊর্ধ্বলোকে যেতে পারে না। তাই যিশু যখন সশরীরে ঊর্ধ্বপানে চলে যাচ্ছিলেন তখন তাঁর শিষ্যগণ অবাক দৃষ্টিতে আকাশপানে তাকিয়ে ছিল। পরে যিশু তাঁদের নিয়ে গেলেন বেথানিয়ার কাছাকাছি একটি জায়গা পর্যন্ত; সেখানে গিয়ে দুইহাত তুলে তিনি তাঁদের আশীর্বাদ করলেন এইভাবে আশীর্বাদ করতে করতে তিনি তাদের ছেড়ে চলে গেলেন; স্বর্গে উন্নীত হলেন তিনি' *(লুক ২৪:৫০-৫১)*। বাইবেলের শিষ্যচরিত গ্রন্থেও যিশুর স্বর্গারোহণের বর্ণনায় আছে - তিনি এইভাবে চলে যাচ্ছেন আর তাঁরা আকাশের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন, এমন সময় হঠাৎ সাদা পোশাক পরা কারা দুইজন তাঁদের পাশে এসে দাঁড়ালেন। তাঁরা বললেন, এ কি, গালিলেয়ার মানুষেরা, তোমরা এখানে আকাশের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছো কেনো? এই যে যিশু, যিনি তোমাদের কাছ থেকে স্বর্গে উন্নীত হলেন, জেনে রাখো, তাঁকে যেভাবে স্বর্গে যেতে দেখলে সেইভাবেই তিনি আবার ফিরে আসবেন" *(শিষ্যচরিত ১:১০-১১)*। এছাড়াও পবিত্র বাইবেলের বিভিন্ন গ্রন্থের পদগুলো *(যথা মার্ক ১৬:১৯; যোহন: ৭:৩৩; যোহন: ৬:৬২;; শিষ্যচরিত ২:৩৩; শিষ্যচরিত ১:৯; ১ম করিন্থীয় ৩:১৬ ও ১ তিমথি ৩:১৬)* যিশুর স্বর্গারোহণের কথা ব্যক্ত করে। যিশুর স্বর্গারোহণ খ্রিস্টবিশ্বাসীদের কাছে বিশ্বাসীয় ঐতিহাসিক সত্য ঘটনা। কাথলিক মণ্ডলীর ধর্মশিক্ষা গ্রন্থের ৬৫৯ অনুচ্ছেদে বলা হয়, "তাদের সঙ্গে কথা বলার পর প্রভু যিশুকে ঊর্ধ্বে, স্বর্গে তুলে নেওয়া হল, এবং তিনি ঈশ্বরের ডান পাশে আসন নিলেন"। খ্রিস্টের ... ঢাকা ছিল। যিশুর সর্বশেষ দর্শনদান, তাঁর মানবতা নিয়ে ঐশমহিমায় চূড়ান্ত প্রবেশের সঙ্গেই শেষ হয়ে গেছে, যা "মেঘ এবং ঊর্ধ্বলোক" -এর প্রতীকের দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে, যেখানে তিনি সেই সময় থেকে পিতার ডানপাশে সমাসীন রয়েছেন। ৬৬১ অনুচ্ছেদে যিশুর সাথে আমরাও যে স্বর্গে যেতে পারবো সে কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে। দেহধারণের মধ্যদিয়ে যিশু স্বর্গ থেকে নেমে আসেন আর স্বর্গারোহণের মধ্যদিয়ে পিতার কাছে স্বর্গে যান। "স্বর্গে কেউই গিয়ে ওঠেনি, সেই একজন ছাড়া যিনি স্বর্গ থেকে নেমে এসেছেন–তিনি মানবপুত্র। নিজের স্বাভাবিক ক্ষমতাবলে মানুষ কখনো "পিতার গৃহে" পরমেশ্বরের জীবন ও আনন্দে প্রবেশ করতে পারে না। একমাত্র খ্রিস্টই মানুষের জন্যে সেই প্রবেশদ্বার উন্মুক্ত করতে পারেন, যাতে আমরা তাঁর অঙ্গ-প্রতঙ্গ, আশা করতে পারি যে, আমরাও সেখানে যাবো যেখানে তিনি, আমাদের মস্তক এবং আমাদের উৎস, আমাদের অগ্রগামী হয়েছেন।"

পবিত্র বাইবেলে যিশুও প্রতিশ্রুতি দেন আমরা তাঁর সাথে একাত্ম হয়ে পিতার কাছে যেতে পারবো। "আমি তোমাদের সত্যি-সত্যি বলছি, আমার প্রতি যে বিশ্বাস রাখে, আমি যে সমস্ত কাজ করি, তা সেও করবে, এবং তার চেয়ে মহত্তর কাজও করবে, কারণ আমি পিতার কাছে যাচ্ছি *(যোহন: ১৪:১২)* ।" "আমার পিতার গৃহে অনেক বাসস্থান আছে; যদি না থাকত, তবে তোমাদের বলেই দিতাম; আমি তোমাদের জন্য স্থান প্রস্তুত করতে যাচ্ছি *(যোহন: ১৪:২)* ।" যিশুতে বিশ্বাস, যিশুর আদেশ পালন এবং কাজে তা প্রকাশ করার মধ্যদিয়েই আমরা স্বর্গে যেতে পারি বা এ ধরাকে স্বর্গে পরিণত করতে পারি যেখানে ঈশ্বর উপস্থিত থাকেন।

মৃত্যুঞ্জয়ী প্রভু যিশুর পুনরুত্থান ও স্বর্গারোহণ যেমনি সত্য, তেমনি সত্য যে তিনি আমাদের ভালবাসেন। ভালবেসেই যিশু আমাদের বন্ধু করেছেন, তাঁর সমকক্ষ করেছেন যেন আমরা পরস্পরের বন্ধু হই, তাঁর দূত, তাঁর মঙ্গলবার্তার বাহক হই। কারণ যিশু স্বর্গারোহণের মুহূর্তে আমাদের প্রেরণ করেছেন এ জগতের কাছে ভালোবাসার বাণী ছড়িয়ে দিতে। খ্রিস্ট স্বর্গারোহণ করে আমাদের বিশেষ অনুগ্রহ দান করেছেন; কেননা তিনি স্বর্গে আরোহন করে আমাদের জন্য স্বর্গদ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছেন যেন আমরা স্বর্গস্থ পিতার গৃহে প্রবেশ করে তাঁর সঙ্গে মিলিত হতে পারি। তাই আমাদের যাত্রা হোক ঊর্ধ্বলোকের পানে কল্যাণ ও শান্তির সাথে।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

১। জুবিলী বাইবেল
৩। কাথলিক মণ্ডলীর ধর্মশিক্ষা গ্রন্থ
২। সাপ্তাহিক প্রবিশী, বর্ষ- ৭৮, সংখ্যা-১৬॥

উত্তরবঙ্গে ভাওয়াল অভিবাসন পূর্তি (১৯২০-২০২০) উৎসব

ফাদার দিলীপ এস কস্তা

প্রারম্ভিকা

বাংলাদেশ খ্রিস্টমণ্ডলীর আলোচিত ও পরিচিত একটি খ্রিস্টজনপদ ভাওয়াল এলাকা। গাজীপুর জেলার ভাওয়াল অঞ্চলে খ্রিস্টের বাণী রোপণ করা হয়েছিলো ৪০০ বছর পূর্বে। ভাওয়াল অঞ্চলের প্রাণকেন্দ্র নাগরী ধর্মপল্লী। নাগরী ধর্মপল্লীটি ইতালীর তলেন্ত নগরের সাধু নিকোলাসের নামে উৎসর্গকৃত। ধর্মপল্লীটি প্রতিষ্ঠা লাভ করে ১৬৯৬ খ্রিস্টাব্দে। জনশ্রুতিসহ তথ্য থেকে জানা যায় যে ভাওয়াল অঞ্চলে খ্রিস্টবাণী প্রচারিত হয় ডোম আন্তনিও কর্তৃক (১৬৪৩-১৬৯৫)। নাগরীর আশেপাশের অঞ্চলগুলিতে ডোম আন্তনিও'র প্রচার ক্ষেত্র ছিল। পঞ্চদশ শতাব্দীর শুরু থেকে ভারত উপমহাদেশে ইউরোপীয় মিশনারীগণ আসতে থাকে। পরবর্তীতে আমেরিকান মিশনারীগণ পূর্ববঙ্গে আগমন করেন। ফলে ভাওয়াল অঞ্চলে খ্রিস্টধর্ম প্রচার ও প্রসার লাভ করে এবং বেশ কয়েকটি ধর্মপল্লী গড়ে ওঠে। ধর্মপল্লীগুলো হলো: নাগরী (১৬৯৬), তুমিলিয়া (১৮৪৪), মাউসাইদ (১৮৯৩), রাঙ্গামাটিয়া (১৯২৪), মঠবাড়ি (১৯২৫), ধরেণ্ডা (১৯২৫)। পরবর্তীকালে আরো একটি ধর্মপল্লী গড়ে উঠে। ভাওয়াল খ্রিস্টান জনগোষ্ঠি ছিলো দরিদ্র এবং হিন্দুধর্ম থেকে ধর্মান্তরিত খ্রিস্টান। আর্থিক স্বচ্ছলতা খুব কম ছিল বলেই অনুমেয়।

উত্তরবঙ্গে ভাওয়াল খ্রিস্টান অভিবাসন (১৯২০-২০২০)

খুব সম্ভবত ১৯১১/১২ খ্রিস্টাব্দে এ ভাওয়াল এলাকায় দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিলো। খাদ্যাভাবসহ নানাবিধ অভাব ও অসুবিধার কারণে ভাওয়ালের খ্রিস্টবিশ্বাসী ভক্তেরা নানা স্থানে বসতি গড়তে শুরু করে। ভাওয়াল ধর্মপল্লীগুলো থেকে খ্রিস্টভক্তরা নিজেদের সুখ-সমৃদ্ধি ও নিরাপদ জীবন-যাপন করার লক্ষ্যে নাগরী অঞ্চল থেকে ভাওয়ালের আশে-পাশে যেতে শুরু করে। ভাওয়াল খ্রিস্টান অভিবাসনের প্রধান কারণ ছিলো অভাব-অনটন, চাষ জমির স্বল্পতা, খরা-দুর্ভিক্ষ ইত্যাদি। মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি হলো নিরাপদ জীবন, সহায়-সম্পত্তি ও উন্নতির দিকে অগ্রসর হওয়া। তাই সভ্যতার যাত্রাপথে অভিবাসন নতুন কিছু নয়। মানুষের সুযোগ-সুবিধা, জাতি-গোষ্ঠির সান্নিধ্য ও কর্মসংস্থানের কারণে অভিবাসন লক্ষ্য করা যায়। পবিত্র বাইবেলে অভিবাসনের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলিতে এখন অভিবাসন প্রক্রিয়া চলমান।

ভাওয়াল খ্রিস্টানদের ধর্মপল্লীগুলি শীতলক্ষা নদীর তীর ঘেঁষে অন্যদিকে উত্তরবঙ্গে ভাওয়াল অভিবাসনের ধর্মপল্লীগুলিও বড়াল নদ ও দেশের সুবৃহৎ চলন বিলের তীরে অবস্থিত। নাগরী ধর্মপল্লীর পল গমেজ যিনি পলু শিকারী নামে পরিচিত তিনি ১৯২০ খ্রিস্টাব্দের দিকে চাটমোহর থানার লাউতিয়া গ্রামে প্রথম এসেছিলেন বন্য শুকর শিকার করার উদ্দেশ্যে। ২০০ মাইলের ব্যবধানে অপরিচিত এই স্থানে পলু শিকারী এসেছিলেন ব্যাপিস্ট পালকের নিমন্ত্রণে। বন-জঙ্গলে ঘেরা পতিত জমি তার ভালো লেগেছিলো। দেরী না করে তাঁর ভাই ও কতিপয় আত্মীয়-স্বজনকে আহ্বান জানান উত্তরবঙ্গে। সাহসী শিকারী পল গমেজের সাথে তার ভাইয়েরা লাউতিয়ায় বসতি গড়ে তুলেন। সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে আসতে থাকেন ডেঙ্গরী, চার্লি, নসু গোসাল, নাগরসহ আরো অনেকে। বন্য হিংস্র প্রাণী ও বন-জঙ্গলের মধ্যে জন বসতি গড়ে ওঠে; মিশনারী যাজকের আগমনে খ্রিস্টভক্তগণ আশার আলো দেখতে পায়। গির্জা, ধর্মপল্লী, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান, স্বাস্থ্যসেবার দাতব্য চিকিৎসালয়সহ জীবন ধারণের প্রয়োজনে সকল কিছু তৈরি হয় ধীরে-ধীরে। সময়ের ব্যবধানে ১৯২০ থেকে ২০২০; একশত বছরের ব্যবধানে। অভিবাসনের শতবর্ষ পূর্তি উৎসব খুব শীঘ্রই উদ্‌যাপিত হতে যাচ্ছে।

'শতবর্ষের অনুগ্রহে' শতবর্ষ উৎসব

উৎসব মানুষের জীবনের অন্যতম একটি বাস্তবতা বা ঘটনা যা মানুষকে আনন্দ দান করে, অতীতকে ফিরে দেখার ও মূল্যায়ন করার সুযোগ পায়, ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। উত্তরবঙ্গে ভাওয়াল খ্রিস্টান অভিবাসন (১৯২০-২০২০) একটি ঐতিহাসিক ঘটনা এবং ঐশ 'অনুগ্রহের বর্ষকাল'। ঈশ্বরে বিশ্বাসীভক্ত মানুষ অভিবাসনের মাধ্যমে শত ধারায় আশীর্বাদে মণ্ডিত হয়েছে। আধ্যাত্মিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে আলোকিত ও উন্নত জীবন গড়েছেন ভাওয়াল অভিবাসিত খ্রিস্টভক্তগণ। শতবর্ষের যাত্রাপথে কত শত কথা, অভিজ্ঞতা, চাওয়া-পাওয়ায় জীবন অভিজ্ঞতা আশা-আনন্দ ও ধন্যবাদ-কৃতজ্ঞায় পূর্ণ হয়েছে। ব্যক্তি জীবন থেকে সামগ্রিক জীবনে উন্নয়ন এসেছে। নিরাপত্তা ও বসতি গড়ার মাধ্যমে মানুষের এসেছে প্রশান্তি ও আত্মতৃপ্তি। তাই এই বর্ষকে ঘিরে 'শতবর্ষের অনুগ্রহ' পূর্তি উৎসব যা উত্তরবঙ্গে ভাওয়াল খ্রিস্টবিশ্বাসীগণ নিজেদের আত্মপরিচয়ের অন্বেষণ, অনুপ্রেরণা, মিলন ও একতার একটি সুযোগ পাবে। নানাভাবে ঐশ অনুগ্রহ ও আশির্বাদে আমাদের জীবন যে পরিপূর্ণ সেই চিন্তা ও মূল্যায়ন করার সুযোগ হবে এই 'শতবর্ষ উৎসব' উদ্‌যাপনের মাধ্যমে।

উৎসবের আয়োজন সবার

যে কোন উৎসবের পূর্ণতা লাভ করে স্বতস্ফূর্তভাবে সবার অংশগ্রহণের মাধ্যমে। উত্তরবঙ্গে ভাওয়াল খ্রিস্টান অভিবাসন ঘটনাটি অভিবাসিত সবার জন্য একটি স্মরণীয় ঘটনা। ইতোমধ্যে রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের দক্ষিণ ভিকারিয়ায় শতবর্ষ উদ্‌যাপনের প্রাথমিক প্রস্তুতি কয়েক দফায় মিটিং ও আলোচনা করা হয়েছে। কোভিড- ১৯ এর কারণে উৎসব উদ্‌যাপন করা সম্ভব হয়নি। মথুরাপুরে সাধ্বী রীতা'র পর্ব উদ্‌যাপন করা হয় ২২ মে- যা ধর্মপল্লীর প্রতিপালিকার পর্ব। সাধ্বী রীতা'র পর্ব দিনেই ভাওয়াল শতবর্ষের পূর্তি উৎসব ধর্মপল্লী পর্যায়ে উদ্‌যাপন করা হবে। উৎসবকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য মথুরাপুর ও কাতুলীর সাধু আন্তনীর চত্বরে দুটি স্মারক ক্রুশ স্থাপন করা হয়েছে এবং সাধ্বী রীতার ধর্মপল্লীর চত্বরে সাধ্বী রীতা'র স্মারক মূর্তি স্থাপন করা হয়েছে। শতবর্ষের মাহেন্দ্রক্ষণে অভিবাসন স্মারক ক্রুশ আমাদেরকে খ্রিস্টবিশ্বাস, ত্যাগ ও কষ্টের কথা স্মরণ করিয়ে দিবে। আমাদের গোটা জীবনই ক্রুশের আদর্শে পরিচালিত এবং জীবনের পরিসমাপ্তি ও ক্রুশ চিহ্ন আঁকার মধ্য দিয়ে আমাদের খ্রিস্টীয় জীবনে অনুগ্রহ-কৃপা-আশীর্বাদ লাভ করি। 'শতবর্ষের উৎসব'কে ঘিরে প্রস্তুতি আমাদেরকে শিকড়ের সন্ধানে যেতে সহায়তা দান করবে এবং ঐতিহাসিক এই ঘটনাকে স্মরণ করার মাধ্যমে নিজেদের আত্ম-পরিচয়ের পূর্ণতা লাভ করবে।

ভাওয়াল খ্রিস্টীয় জীবনের বাস্তবতা

ভাওয়াল খ্রিস্টীয় জীবনের চালচিত্র ছিল

গ্রামীণ পটভূমির এবং কৃষি পেশার সাথে সম্পৃক্ত। জীবন জীবিকার প্রয়োজনে মানুষ কৃষি থেকে চাকুরী, ব্যবসা, শিক্ষকতাসহ নানা ধরণের পেশার সাথে যুক্ত হয়েছেন। তাই বর্তমান বাস্তবতায় কৃষিকাজের প্রতি আগ্রহ কমে আসছে। শিক্ষিত হবার কারণে চাকুরী ও বিদেশে যাবার প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রৈতৃক ভিটা ও সম্পদ রক্ষা করার ক্ষেত্রে সমস্যা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। ভাওয়াল খ্রিস্টীয় জীবনের কৃষি যেমন ছিল প্রধান পেশা, অন্যদিকে ধর্মীয় ও সামাজিক জীবন ভিত্তি ছিল দৃঢ় ও মজবুত। অভাব-অনটনের মাঝেও মানুষের মধ্যে মিলন-ভ্রাতৃত্ব, সহানুভূতি ও মমত্ববোধ ছিল তীব্রভাবে। বর্তমান বাস্তবতায় পরিবার ছোট হয়ে আসছে- সাথে সাথে সহভাগিতা-সহযোগিতা কমে আসছে। অর্থনৈতিক অবস্থার যেমন স্বচ্ছলতা এসেছে তেমনি ঋণগ্রস্ত মানুষের সংখ্যাও একেবারে কম নয়। ধর্মীয় জীবনেও শিথিলতা এসেছে- পারিবারিক প্রার্থনার প্রচলনও কমে আসছে। ভাওয়াল খ্রিস্টীয় জীবনের অন্যতম অনুশীলন ছিল মাণ্ডলীক শিক্ষাকে বিশ্বাস ও ভক্তির সাথে পালন করা। তাই ভাওয়াল অধ্যুষিত এলাকা থেকে ফাদার, ব্রাদার ও সিস্টার হয়েছেন অনেকজন। যাজকীয় ও ব্রতীয় জীবনের কিছুটা হলেও ভাটা পড়েছে। কাছাকাছি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থাকা সত্ত্বেও আশানুরূপ শিক্ষিত মানুষ দেখা যায় না। বাবুর্চি, দাড়োয়ান, ড্রাইভিং কাজে আগ্রহ অনেক মানুষের। ভাওয়ালের মানুষদের নিজেদের জীবন, কৃষ্টি ও ঐতিহ্যের দিকে ফিরে তাকানোর এবং আত্ম-বিশ্লেষণের সময় এসেছে।

উত্তরবঙ্গের ভাওয়াল খ্রিস্টানদের প্রধান পেশা ছিলো কৃষি। বর্তমান বাস্তবতায় কৃষিকাজ প্রায় উঠে গিয়েছে। যথাযথ শিক্ষা ও দক্ষতার অভাবে চাকুরী পাওয়াও দুষ্কর হয়ে পড়েছে। তাই অনেকের অর্থনৈতিক অবস্থা নাজুক। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো পরিচালনার জন্য যোগ্য ব্যক্তির অভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। কষ্ট-ত্যাগের জীবনে এগিয়ে আসার মানুষ কমে আসছে। আধুনিক হবার নামে আরামপ্রিয় ও কর্মবিমুখ মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে বলেই মনে হয়। ধর্ম ও কর্মনিষ্ঠা হবার পথই হলো প্রকৃত উন্নয়নের পথ ও পাথেয়। তাই পূর্ব-পুরুষদের প্রার্থনাশীল ও ত্যাগময় জীবন অনুসরণ করা আমাদের নৈতিক ও মানবিক দায়িত্বও বটে।

'সবারে করি আহ্বান'

বাঙালির নিত্যদিনের অনুপ্রেরণাদানকারী কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) সবাইকে আহ্বান জানিয়ে বলেন, "সবারে করি আহ্বান এসো উৎসুকচিত্ত, এসো আনন্দিত প্রাণ/হৃদয় দেহো পাতি, হেথাকার দিবারাতি করুক নবজীবন দান"। একটি জাতি-গোষ্ঠির সার্বিক উন্নয়নের পথ হলো এক মূল্যবোধে পথচলা এবং সাংস্কৃতিক ও সামাজিক জীবনকে সজীব করে তোলা। ভাওয়াল খ্রিস্টীয় জীবনে রয়েছে নানাবিধ লোকাচার ও লোকবিশ্বাস। সামাজিক এবং ধর্মীয় জীবনকে ঘিরে অজস্র লোকাচার ও কৃষ্টি রয়েছে- যা অনুশীলন করার মাধ্যমে জীবনের পূর্ণতা লাভ করে। 'শতবর্ষ' পূর্তি উৎসব উদ্‌যাপন করার মাধ্যমে আমাদের সামগ্রিক জীবনের সাংস্কৃতিক বিষয়গুলো অনুশীলনের চেতনা বাড়বে। ভাওয়াল কৃষ্টির মধ্যে- কীর্তন, বৈঠকী গান, কষ্টের গান, সাধু-সাধ্বীদের জীবনভিত্তিক পালাগান, সর্বজনের ভক্তি ও জনপ্রিয় 'সাধু আন্তনীর পালা', যিশুলীলা, পারিবারিক জপমালা প্রার্থনা, মানত দান ইত্যাদি। সামাজিক জীবনের বিবাহ মৃত্যু ও সংস্কারীয় জীবনে সবার স্বতস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ও সহযোগিতা লক্ষ্যণীয় ছিলো। দিন বদলের সাথে-সাথে সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় জীবনের অনেক কিছুই বদল হচ্ছে যা যুগোপযোগী পদক্ষেপ। সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে কিছুটা বদল আসে যুগের পরিবর্তনের কারণে তবে খ্রিস্টীয় ও সামাজিক মূল্যবোধগুলো রক্ষা করে।

উত্তরবঙ্গে ভাওয়াল অভিবাসনের শতবর্ষের পূর্তি (১৯২৯-২০২০) উৎসব সবার জন্যই আনন্দ-ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা উৎসব হবে বলে আশা করি। মানুষের জীবনের প্রকাশ ও বিকাশ ঘটে সাংস্কৃতিক জীবনকে বিকশিত করার মধ্যদিয়ে। শতবর্ষের পূর্তি উৎসবটি আত্ম-মূল্যায়ন ও নতুনভাবে পথচলার অনুপ্রেরণার উৎসব হয়ে উঠুক সবার জীবনে। স্বতস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ও ফিরে দেখার মাধ্যমে আমাদের জীবন নবায়িত ও নতুন চেতনায় পরিপূর্ণ হোক। শতবর্ষের শত কথা, অভিজ্ঞতা, আনন্দ-ব্যথা-বেদনার মধ্যে আমাদের জীবন প্রাণবন্ত ও সজীব হয়ে উঠুক। শতবর্ষের শত অনুগ্রহ, আশীর্বাদে আমাদের জীবন আনন্দ ও ঐশ মাধুর্যে পূর্ণ হোক। জয় হোক শতবর্ষের জয়ন্তী উৎসবের॥

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

প্রতিবেশী'র বার্ষিক চাঁদা পরিশোধ করেছেন কি?

গৌরবময়ী মা মাদার আগ্নেশ

(১২ পৃষ্ঠার পর)

কাজে, পরামর্শে তারা আজও মাদারকে ভুলতে পারেনি! জানি না ভবিষ্যতে ভুলতে চাইলেও ভগ্নীগণ ভুলে যেতে পারবেন কিনা।

মাদারের ঐকান্তিক পরিশ্রম ও ভালবাসার ফলস্বরূপ আমরা দেখতে পাই প্রেরিতগণের রাণী মারীয়া সঙ্গিনী সংঘের সিস্টারগণ ফুলে-ফলে বৃদ্ধি পেয়ে বাংলাদেশের আটটি ধর্মপ্রদেশে এমনকি দেশের বাইরেও ইতালীতে সেবা দান করছেন। এতে কিন্তু মাদারের অবদান কোন অংশেই কম নয়। তাই মন বলছে– সত্যিই সংঘের প্রথম দিকের সিস্টারগণ যারা মাদারের সংস্পর্শে ছিলেন তারা কত না ভাগ্যবতী, তাদের মুখে যখন মাদার সম্পর্কে শুনি আমাদের আপসোস হয় তাকে যদি একবার দেখতে পেতাম। ভাবতে অবাক লাগে অতীতের দিনগুলি বর্তমান থেকে কত কষ্টকর ছিল। সে তুলনায় এখন আমরা কতোই না ভালো আছি। সবই যে তাঁরই ইচ্ছা। তবে এও সত্য যে আমাদের অগ্রজা ভগ্নীগণ যদি তাদের জীবনে কষ্টভোগ করতে অস্বীকার করতেন তাহলে আজ আমাদের এসএমআরএ পরিবার যা আছে তা কখনো আশা করা যেতো না! তাই আমরা কৃতজ্ঞপ্রাণে মাদারকে এবং আমাদের অগ্রজা ভগ্নীদেরকে জানাই অসংখ্য ধন্যবাদ।

সবশেষে বলতে চাই যে সংঘে প্রবেশ করে মাদারের জীবনী যখন শুনেছি তখন জেনেছি ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে মাদার ৫ম শ্রেণী পাশ করে এই ধর্মসংঘে প্রবেশ করেছেন। মাত্র তেরো বছর বয়সে এই সংঘে তিনি ধর্মীয় পোসাক লাভ করেছেন এবং তিনি তার জীবনে সফল হয়েছেন। তিনি শুধু মাত্র সিস্টারই নন ঈশ্বর যে তাকে সকল সিস্টারদের মা হবারও সুযোগ করে দিয়েছেন। তিনি সিস্টারদের সবাইকেই অনেক বেশি ভালবাসতেন এবং সিস্টারগণও তাকে ভালবাসতেন। সংঘে আমরা অনুজা ভগ্নীগণ যারা মাদারকে দেখিনি তারা এসব শুনেই বিশ্বাস করি এবং মাদারের জন্য গর্ব বোধ করি। আজকের এই জন্মশতবার্ষিকীতে আমরা সবাই তার আশীর্বাদ চাই যেন আমরা তার মত একজন আদর্শ সিস্টার হয়ে দেশের ও দশের সেবা করতে পারি এবং জীবন স্বামী যিশুকে প্রাণভরে ভালোবাসতে পারি। মাদারের কাজ-কর্ম জীবন-যাপন মণ্ডলীতে সারা জাগিয়ে এসএমআরএ সংঘে তিনি গৌরবময়ী মা হয়েছেন এবং আমরা বিশ্বাস করি যে, তিনি এখন স্বর্গে পরম পিতার অতি সন্নিকটে বাস করছেন॥

মা এক যুদ্ধ জয়ের গল্প

সিস্টার মেরী জেনেভী এসএমআরএ

"আফা কই যাইবেন, ও সাদা আফা কই যাইবেন।" ডাকটা শুনে প্রথমে বুঝতে পারিনি আমাকে ডাকা হচ্ছে যখন শুনলাম ও সাদা আফা কই যাইবেন তখন কৌতূহলবশত পিছনে ফিরলাম দেখলাম একজন মহিলা রিক্সা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এটা বেশ কয়েক বছর আগের কথা, মহাখালি বোনের বাসা থেকে বের হয়ে গলি দিয়ে হাঁটছিলাম মেরী হাউজ, তেজগাঁও আসবো বলে। ঠিক তখনই তার সাথে দেখা। আবার জিজ্ঞেস করল– "কই যাইবেন আফা" বললাম আমার গন্তব্যের কথা। সে বলল-"উঠেন আফা" আমিও উঠে বসলাম। বেশ ভালো রিক্সা চালানতো আপনি, আমি কথা বলতে শুরু করলাম। কাত হয়ে একটা মুচকী হাসি দিলেন। আমি বললাম একটু আস্তে-আস্তে যান, আপনার সাথে একটু গল্প করি। তিনি বললেন কী গল্প আফা, আমি কেন রিক্সা চালাই তার গল্প? আমি বললাম যদি আপনার অসুবিধা না থাকে তবে। উনি বললেন না অসুবিধা কী বলেন আফা। জানেন তো আফা মা হওয়ার কি জ্বালা, পোলাপানের খাওন যোগানের লাইগা রিক্সা চালাই। দুইডা পোলাপান। পোলাডা বড়, মাইয়াডা ছোট। মাইয়াডা পেটে থাকতেই ওর বাপ আমাগরে ফালাইয়া গেছে। তহন বয়স আরও কম আছিল। আবার বিয়া হওনের লাইগা অনেক কয়ছিল। কিন্তু নিজের সুখের জন্য পোলাপানের দুঃখের কারণ কেমনে অই কন। যার লগে বিয়া অমু সে যদি ওগোরে না দেহে তাই নিজের পথ নিজেই বাইর কইরা নিছি। এভাবে তার গল্প শুনতে শুনতে আমার গন্তব্যে পৌঁছে গেলাম। নামার সময় তার নাম জিজ্ঞাসা করলাম আয়েশা তার নাম। আয়েশার মা হওয়ার যে যুদ্ধ তা তার জীবনযুদ্ধ এমনি যে যুদ্ধ তার পথচলার সব বাঁধা অতিক্রম করার শক্তি যোগায়।

আর একজন মাকে কাছ থেকে দেখেছি বলতে গেলে ছোট থেকে তার বেড়ে উঠা এবং তিল তিল করে তার মা হয়ে উঠাটা খুব কাছ থেকে দেখেছি। ছোট থেকে পড়াশুনার খুব ঝোঁক ছিল তার, সব সময় স্বপ্ন দেখতো ভালো পড়াশুনা করে চাকুরী করবে। নিজের পায়ে দাঁড়াবে। ঈশ্বর তার স্বপ্ন পূরণও করেছেন। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধা তালিকায় ২য় স্থান অধিকার করে (এম বি এ) পাশ করে একটা ব্যাংকে চাকরী পেয়েছে তার পরে ভালো একটা পরিবারে বিয়ে হয়েছে, স্বামী, শ্বাশুড়ী,ননদ, ভাসুর একটা বড় ও সুখী পরিবার। সবাই ভালোবাসে তাকে। এরপর শুরু হওয়ার গল্প। প্রথম সন্তানের জন্ম দিয়ে এক নতুন জীবনের শুরু হলো। বেশ কয়েক বছর চাকুরী করার পর সন্তান, সংসারের প্রয়োজনে নিজের স্বপ্নের একটা অংশ উৎসর্গ করে দিয়ে চাকুরীটা ছেড়ে দিল সে। এখন ২ ছেলের মা রীতিমতো পাকা গৃহিনী। সন্তানরাই তার স্বপ্ন। যেহেতু বড় ছেলেটা একটু অসুস্থ তাই তার জন্য প্রচুর শ্রম ও সময় দিতে হয়। তবে স্বামী এবং পরিবারের প্রত্যেকেই তার পাশে আছে, সবাই অনেক সহযোগিতা সমর্থন দিয়ে তার শক্তি হয়ে আছে।

আমাদের প্রত্যেকের পরিবারের মা-ই- এক একজন যোদ্ধা সৈনিক এবং তারা নিজ-নিজ ক্ষেত্রে বিজয়ীও বটে। রবীঠাকুর বলেন- "নাড়ীর মধ্যে আবদ্ধ শিশু তার মাকে পায়না যখন সে তার নাড়ী কেটে বাইরে আসে তখনই সে তার মাকে পরিপূর্ণভাবে পায়।" স্বার্থপরের মতো আমরা আমাদের মায়ের সব সেবা-যত্ন তাদের সব সুখ ভোগ করি বদলে তাকে আমরা বিজয় মুকুটটা দিতে পারি না। পরিবারে মা যে কী তা আমরা প্রত্যেকেই উপলব্ধি করতে পারি। আজ মা দিবস মায়ের জন্য হয়তো একটা শুভেচ্ছা বাণী বা এসএমএস বা একটা উপহার দিয়েই আমরা আমাদের দায়িত্ব পালন করে থাকি। কিন্তু এই বিজয়ী মায়ের যে মুকুট তা তো এই সামান্য উপহার দিয়ে দেওয়া যাবে না। যখন আমরা মাকে তার উপযুক্ত যত্ন, সম্মান, শ্রদ্ধা, তার একাকীত্বে তার পাশে থাকা, তাকে উষ্ণ ভালবাসা দিয়ে তাকে আনন্দে রাখা এইসব দিতে পারবো তখন সেটাই হবে তার বিজয় মুকুট। একটা বড় এওয়ার্ড।

আমরা যদি মঙ্গলবাণীর দিকে তাকাই দেখতে পাব যিশুর জীবনের শুরু থেকে তাঁর ক্রুশীয় মৃত্যু পর্যন্ত মা মারিয়া তাঁর পাশে পাশে হেঁটেছেন। যিশুর এই যাতনায় তিনিও অংশীদার হয়েছেন। যিশুর শক্তি হয়ে কালভেরী আরোহণ করেছেন। তাই তাকে স্বর্গের গৌরব মুকুটে ভূষিত করা হয়েছে। ভাবছিলাম আজ মা দিবসে প্রভু যিশু নিশ্চয়ই স্বর্গে তাঁর মায়ের জন্য এক উৎসবের ব্যবস্থা করেছেন। আর আমাদের মায়েরা যারা স্বর্গবাসী হয়েছেন তাদেরও নিশ্চয়ই তিনি শুভেচ্ছা দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। কারণ প্রভু যিশু ক্রুশে থেকেও তাঁর মায়ের দায়িত্ব পালনের কথা ভুলে যাননি। তাঁর প্রিয় শিষ্যের কাছে তিনি তাঁর মায়ের দায়িত্ব দিয়ে গেছেন।

মায়েরা তার সন্তানদের জন্য প্রতিনিয়ত নিজের সর্বস্ব দিয়ে যাচ্ছেন বিনিময়ে কি তারা তাদের সন্তানদের কাছে কিছু প্রত্যাশা করেন বরং তারা তাদেরই সন্তানদের সুখ নাতি নাতনীদের ভাল লেখাপড়ার সুযোগ দেওয়ার জন্য একাকী জীবনটা বেছে নেন আর সন্তানেরা শহরবাসী বা বিদেশ যাত্রী হয়ে দূরে পাড়ি জমান। এরপরও দূরে থেকেও আমরা দায়িত্ব পালন করতে পারি। অনেক সময় ভাবি তাদের সেবা-যত্ন করতে বা তাদের সময় দিতে গিয়ে নিজেদের সময় নষ্ট হয়। অথচ এই মা-ই নিজের সর্বস্ব দিয়ে আমাদের সব অসুস্থতা, কষ্টে রাত জেগে আমাদের সেবা করেছেন কত বিনিদ্রায় রাত কাটিয়েছেন। অনেক সময় সন্তানদের অসুস্থতার কথা শুনে হিরোসীমা নাগাসাকির মতো এক একটা বিস্ফোরণ ঘটেছে তাদের হৃদয়ে।

আজ মা দিবসে যদি মায়েদের কৃতিত্বের কথা বলতে চাই তাহলে তার শেষ হবে না। মায়েরা সন্তানদের জীবনে শুভ-মঙ্গলময় দিকই দেখতে চান। একজন যাজক ভাই একবার তার সহভাগিতায় বলেছিলেন তার সারাদিনের সব কার্যক্রমের পর প্রতিদিন তিনি তার মায়ের সাথে কয়েক মিনিট কথা বলেন। তার অনুভূতি এই রকম যে আমার ভাই-বোনেরা সংসারে থেকে আমার মায়ের সব দায়িত্ব পালন করেন। আমারও কিছু দায়িত্ব পালন করা উচিৎ তাই আমি মায়ের খোঁজ-খবর নেই কেমন আছেন তিনি। কিন্তু প্রতিবার কথা বলার পর আমি লক্ষ্য করেছি মায়ের কাছ থেকে আমিই নতুন আলো উৎসাহ পেয়েছি। মায়ের সাথে কথা বলার পর আমি যখন পরের দিনের মঙ্গলবাণীর প্রস্তুতি নিতে যাই দেখি প্রতিদিন আমার চিন্তার মধ্যেও একটা বৈচিত্র্য চলে আসে প্রভুর দিকে মনটা বাড়িয়ে দিতে নতুন প্রেরণা পাই। এটাই আসলে মায়ের বৈশিষ্ট্য মা-তো মা-ই 'মা' শব্দটি যেন এক একটা নতুন গল্পের সূচনা। আয়েশার মতো নিজের স্বপ্ন উৎসর্গ করা মায়েরাই প্রতিদিন হয়ে উঠে এক যুদ্ধ জয়ের গল্প। আসুন আজ এই মা দিবসে আমরা সেই সব মায়েদের পাশে দাঁড়াই যাদের জীবনটা কষ্ট ও যাতনায় পূর্ণ। তাদের দিকে ভালোবাসার হাত বাড়িয়ে দেই। যাদের মায়েরা স্বর্গবাসী হয়েছে তাদের জন্য স্বর্গীয় মা মারীয়ার আশীর্বাদ চাই॥

গৌরবময়ী মা মাদার আগ্নেশ

সিস্টার মেরী জয়া এসএমআরএ

মাশব্দটি শুনলেই বুকের ভিতরটা কেমন যেন ধুক্ ধুক্ করে ওঠে! আবার মা বলে যখন নিজেই ডাকি তখন সেই ডাকে মুখটা ভরে যায় এবং বুকটাও যে ফুলে ফুলে ওঠে। জানি না এমনটি কেন হয়, নারীর নাড়ের টানেও হয়তো বা তা হতে পারে। এখানে একটি চিরন্তন সত্য কথা এই যে– মা কারও চিরদিন বেঁচে থাকে না! তাই ইতোমধ্যেই আমি যেমন হারিয়েছি আমার জন্মদায়িনী মাকে তেমনি সংঘে প্রবেশ করে হারিয়েছি এই এসএমআরএ পরিবারের মা জননী শ্রদ্ধেয় মাদারকে। এসব মায়েদের কথা ভাবতেও যে ভীষণ কষ্ট হয় মনে। তবে মাকে নিয়ে চিন্তা করতে গেলে প্রথমেই যে কথাটি চলে আসে ধ্যানে, তাহলে এই যে– কতো কষ্ট করেই না এ মায়েরা তাদের সন্তানদেরকে আগলে রেখেছেন, শত প্রতিকূলতার মাঝেও যে তারা তাদের সন্তানদের পাশে-পাশে থেকেছেন ও তাদের যত্ন নিয়েছেন। সেই সাথে আরও মনে পড়ে যায়– গরমের দিনে বিছানায় শুয়ে শুয়ে মা তার তালা-পাতার পাখা দিয়ে বাতাস করে কতো সহজেই না তার সন্তানের প্রাণটা জুরিয়ে দিয়েছেন। শীত এলে আবার চাদর দিয়ে শীত নিবারণ করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। যিনি এমনি করে নিজেকে ভুলে গিয়ে সন্তানদের মঙ্গল কামনা করেন সেই তিনিই তো আমাদের সবার মা। আর এ মায়েরা যে মরেও আজ অমর হয়ে আছেন আমাদের হৃদয়ে-মনে। এই মায়েরা ধন্য তারা সকল গৌরবের অধিকারিনী। তাই এই মাকে কি কখনো ভুলে যাওয়া সম্ভব ? না, কখনো না! তা যে হতেই পারে না।

তেমনি ভুলতে পারি না ১৯৩৩ খ্রিস্টবর্ষকে। কেননা এ সময়ই যে জন্ম হয় তুমিলিয়াতে, এসএমআরএ নামে এই দেশীয় সংঘটির। আর এমনই দুর্ভাগ্য যে, এ সংঘটির শিশু অবস্থায়ই তারা তাদের সংঘের সহ-স্থাপনকর্ত্রীমাকে হারিয়ে হতাশা, নিরাশায়, নিমজ্জিত হয়ে পড়ে। তিনি ছিলেন একজন হলিক্রস সিস্টার। নাম তার সিস্টার রোজ বার্ণার্ড সিএসসি। তিনি সংঘ স্থাপনকর্তা নমস্য বিশপ তিমথি জন ক্রাউলীর সঙ্গে আন্তরিক সহযোগিতা করেছেন এই এসএমআরএ সংঘটিকে বাংলার বুকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য। তিনি নবীনা সিস্টারদের সঙ্গে সার্বক্ষণিক থেকে সিস্টারদের গঠনের কাজে এবং আধ্যাত্মিক ও অন্যান্য সব কিছুতেই সহযোগিতা করেছেন। তারই প্রত্যক্ষ নেতৃত্বে আমাদের এই ধর্মসংঘটি সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল সত্য। কিন্তু বিধির বিধান– হঠাৎ ১৯৩৮ খ্রিস্টবর্ষের ১৫ আগষ্ট তিনি প্রত্যেককে শোকসাগরে ভাসিয়ে দিয়ে না ফেরার দেশে চলে যান। তার এই চলে যাওয়াতে আমাদের

এই সংঘটি যেন অঙ্কুরেই বিনষ্ট হওয়ার মতো অবস্থা। কিন্তু কথাতো আছে– রাখে হরি, মারে কে? প্রেমময় ঈশ্বরের অসীম ভালবাসায় এই ধর্মসংঘটি এগিয়ে যেতে থাকে বিভিন্ন সহৃদয় ব্যক্তিদের সহায়তায়। এ সময়টিতে সংঘে অনেক উত্থান-পতন আসে এবং নবীনা সিস্টারগণ তাদের স্নেহময়ী মাকে হারিয়ে বহু কষ্টে দিন কাটালেও কেউ হাল ছাড়েননি। তারা ঈশ্বর নির্ভরশীল ছিলেন। কোন কষ্টকেই তারা আর কষ্ট বলে মনে না করে স্নেহময়ী মায়ের আদর্শকে সামনে রেখে এবং সংঘ প্রতিষ্ঠাতার নির্দেশে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে থাকেন। কিন্তু আমরা দেখি যে দুঃখ কষ্ট যখন আসে তখন কিন্তু তারা একা আসে না। আবার খুব শীঘ্রই এই এসএমআরএ পরিবারের সিস্টারগণ তাদের পিতাকে হারান। অর্থাৎ ১৯৪৫ খ্রিস্টবর্ষের ২ অক্টোবর না ফেরার দেশে চলে গেলেন আমাদের প্রিয় সংঘ প্রতিষ্ঠাতা বিশপ তিমথি জন ক্রাউলী, সিএসসি। এবার শুরু হয় সংঘের সিস্টারদের আরও শোচনীয় অবস্থা। কিন্তু আমরা অভিজ্ঞতা করেছি যে ঈশ্বর সদা করুনাময়। তিনি সংঘের এই সঙ্কটময় পরিস্থিতিতে খুঁজে পান সিস্টারদের মধ্য থেকেই একজন সুযোগ্য ব্যক্তিকে, যার মধ্যে রয়েছে নেতৃত্বদানের ক্ষমতা। আসলে ঈশ্বর নিজেই তার এই কাজের জন্য তাকে যোগ্য করেছেন। আর তিনি হলেন আমাদের পরম শ্রদ্ধেয়া মাদার আগ্নেশ। তিনি ১৯৫২ খ্রিস্টবর্ষ থেকেই শক্ত হাতে সংঘের হাল ধরেন এবং এক বলিষ্ঠ নেতৃত্বদানের মধ্যদিয়ে তিনি সুদীর্ঘ ১৬টি বৎসর ধরে এই নবীনা সংঘটিকে সামনের দিকে এগিয়ে নিতে আপ্রাণ চেষ্টা করেন। এই মহিয়সী নারী জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১৯ মে, ১৯২১ খ্রিস্টবর্ষে। আর আজ ২০২১ খ্রিস্টবর্ষে এসে আমরা তার জন্ম শতবর্ষ জয়ন্তী উৎসব উদ্‌যাপন করছি। আমরা তার এই জন্মশতবর্ষ জয়ন্তীতে তার সুন্দর জীবন, জীবন আহ্বান ও সংঘে তার সীমাহীন অবদানের জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাই এবং প্রিয় মাদারের চরণতলে রাখি আমাদের কৃতজ্ঞতার ডালি।

আমরা সবাই লক্ষ্য করেছি যে মাদারের মধ্যে ছিল মাতৃত্ব, ভালোবাসা, তিনি প্রার্থনাশীল ব্যক্তি ছিলেন, দয়া, মায়া-মমতা, আন্তরিকতা, মিষ্টভাষী, সৎ পরামর্শ দাতা, চিন্তাশীল, অমায়িক, ধৈর্য্যশীল, অন্যের দুঃখের ও সুখের সঙ্গী, সাহসী ইত্যাদি বহুগুনে গুনান্বিতা একজন ব্যক্তি। তিনি আমাদের এই নবীনা সংঘটিকে কোন মতেই সমুদ্রে ভেসে যেতে দেননি । সিস্টারদের মুখে শুনেছি তিনি নাকি ছোট থাকতেই সিস্টার হতে চাইতেন এবং এখন তিনি সিস্টার হয়ে এই সংঘের দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন। এসবই যে ঈশ্বরেরই ইচ্ছা ও তাঁরই পরিকল্পনা। ঈশ্বরের অপরিসীম দয়ায় মাদারের অধিনেই এখন রয়েছে অনেক সিস্টার। একদিন তিনি তার পাল-পুরোহিতের কাছে ও নমস্য বিশপ তিমথি জন ক্রাউলীর কাছে গিয়ে নাগরী মিশনের জন্য সিস্টার চেয়েছিলেন আর এখন ঐশরাজ্য বিস্তারের কাজে তিনিই বিভিন্ন জায়গায় সিস্টার পাঠাতে পারছেন। কি সৌভাগ্যই না আমাদের প্রিয় মাদারের! জন্ম শত বার্ষিকীতে মাদারকে আমরা জানাই শতকোটি শ্রদ্ধা, আমাদের সবার অকৃত্রিম ভালবাসা ও প্রাণঢালা অভিনন্দন।

মাদার সেদিন বহু প্রার্থনা-উপবাস, ত্যাগস্বীকার ও অক্লান্ত পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে এবং সর্বোপরি ঈশ্বর নির্ভরশীল হয়ে সংঘের পথপ্রদর্শক হিসেবে, একজন উত্তম মাঝি হয়ে হাল ধরেছিলেন এই এসএমআরএ ধর্ম সংঘের। দিন যতই এগিয়ে চলেছে সিস্টারদের কাজকর্ম, জীবন আদর্শ দেখে দিন দিন সংঘে সংখ্যা বেড়ে চলেছে। মাদারের স্পর্শ যারা পেয়েছেন কথায়,

(১০ পৃষ্ঠায় দেখুন)

শতবর্ষের মাহেন্দ্রক্ষণে পূর্বপুরুষদের শিকড়ের অনুসন্ধান পরিক্রমা

ফাদার সাগর কোড়াইয়া

ইতিহাসকে কখনো অবহেলা করা যায় না। যা সত্য ইতিহাস তা প্রকাশ করবেই। সত্যের অপপ্রলাপ ইতিহাস কখনো করতে জানে না। যা ঘটেছে সেই ঘটনাকে মানুষ একেকভাবে উপস্থাপন করবে ঠিকই; কিন্তু ঘটনার যে সত্য তত্ত্ব তা তো আর বিকৃত করতে পারবে না। আর ইতিহাস সেই সত্যতত্ত্বকে উপস্থাপনেই সদা তৎপর। অনেকের মধ্যে সত্যতত্ত্বকেও বিকৃত করার প্রবণতা দেখা যায়; তবে এটা প্রকাশ করতে হবেই যে, সত্য সব সময়ই সত্য। অনেকে বলতে পারে, যুগের সাথে-সাথে মিথ্যা সত্য এবং সত্য-মিথ্যায় রূপান্তরিত হয়। কিন্তু এটাও সত্য, যা লুকায়িত তা প্রকাশিত হোক বা না হোক সেটার অস্তিত্ব যে রয়েছে সেটা তো সত্য। এমন কিছু সত্য রয়েছে যা আমাদের জীবন থেকে কখনো বাদ দিতে পারি না। আর সেই সত্যগুলোকে উৎঘাটন, উপলব্ধি ও মেনে নেওয়াই বরং মহত্ত্বের লক্ষণ।

বাংলাদেশে জনসংখ্যার পরিসংখ্যানে আমরা খ্রিস্টধর্মাবলম্বীরা খুবই নগণ্য। কয়েক বছর যাবৎ শুনে আসছি খ্রিস্টানদের সংখ্যা ০.০৩%। এখন বেড়েছে না কমেছে বলা যায় না। তবে বাংলাদেশে খ্রিস্টধর্মের ইতিহাস যে বহু পুরাতন তা একবাক্যে বলে দেওয়া যায়। পর্তুগীজদের আগমনের পরই যে বাংলাদেশ অঞ্চলে খ্রিস্টধর্ম প্রচারিত ও প্রসারিত হয়েছে- এটা নিশ্চিত। ভারতবর্ষ সেই সময় যেহেতু ধন-সম্পদ ও মসলার জন্য বিখ্যাত ছিলো তাই পর্তুগীজরা বহু আগে থেকেই জলপথে ভারতবর্ষে আসার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল। যদিও স্থলপথে ইউরোপ থেকে ভারতে আসা যেতো; কিন্তু স্থলপথে সময়, শ্রম ও আর্থিক ব্যয় হতো বিপুল পরিমাণ। তাই ১৪৯৮ খ্রিস্টাব্দে দুঃসাহসিক পর্তুগীজ নাবিক ভাস্কো-দা-গামাই প্রথম ভারতে আসার জলপথ আবিষ্কার করেন। এর পর পরই আরো বণিকগণের আগমনের সাথে-সাথে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের যাজকগণ ভারতীয় উপমহাদেশে আসতে শুরু করেন। সময়ের পরিক্রমায় যাজকগণ বিভিন্ন স্থানে গির্জা তৈরি করেন এবং এদেশের অনেককে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষা দেন।

বোর্ণী, বনপাড়া, মথুরাপুর, ফৈলজানা, ভবানীপুর ও ঝড়াগোপালপুর; এই ছয় মায়ের বাঙালি খ্রিস্টভক্তদের পূর্বপুরুষগণ আদি নিবাস গাজীপুরের ভাওয়াল থেকে এসে এখানে বসতি গড়ে তোলেন। ১৯০০ খ্রিস্টাব্দের প্রথমার্ধে তুমিলিয়া ধর্মপল্লীর কাথলিক লোকসংখ্যার মধ্যে পরিবর্তন দেখা দেয়। লোকসংখ্যা বৃদ্ধি ও ভূমির স্বল্পতার কারণে অনেক পরিবার তুমিলিয়া ও পরবর্তীতে রাঙ্গামাটিয়া ও নাগরী থেকে পাবনা ও নাটোর (তৎকালীন রাজশাহী জেলা) অঞ্চলে এসে নতুন করে বসতি স্থাপন করে। যারা ভাওয়াল থেকে পাবনা ও নাটোরে এসে বসতি গড়ে তোলেন সেই সময় তাঁরা এত সহজে সব কিছু পাননি। তাঁদের জীবনের সাথে প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করে বেঁচে থাকতে হয়েছে। কিন্তু যে খ্রিস্টবিশ্বাস তাঁরা লাভ করেছিলেন তা কোনভাবেই স্খলিত হতে দেননি। এখন প্রশ্ন হলো, পূর্বপুরুষগণ কেন খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন! এক কথায় এর সঠিক কোন উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। পূর্বপুরুষদের খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত হবার রয়েছে বিশাল ইতিহাস।

১৫৯৯ খ্রিস্টাব্দের দিকে জেজুইট যাজকগণ চট্টগ্রামে বাণীপ্রচারের উদ্দেশে আসেন। এ সময় আরাকান-রাজ যাজকদের এই অঞ্চলে বাণীপ্রচারের জন্য অনুমতি দেন। এমনকি আরাকান-রাজ চট্টগ্রামে গির্জা নির্মাণের জন্য অর্থ প্রদান করেন। এই সময় চণ্ডিকা (বর্তমান যশোর) ভুলুয়া (বর্তমান নোয়াখালি) নামক স্থানে পর্তুগীজদের বসতি ছিলো। ফাদার ফার্নান্দেজ চণ্ডিকায় যান এবং স্থানীয় রাজার অনুমতি নিয়ে ১৬০০ খ্রিস্টাব্দে একটি গির্জা নির্মাণ করেন। ফাদার মেলখিয়র ফনসেকা বাখরগঞ্জ (বর্তমান বরিশাল) জেলার বাকলা নামক স্থানে খ্রিস্টধর্ম প্রচার ও দীক্ষাকার্যে বেশ সফলতা লাভ করেন। সেই সময় বেশ কিছু সংখ্যক পর্তুগীজ এই স্থানে বাস করতেন। স্বাভাবিকভাবে এটা ধারণা করা যায় যে, যারা সেই সময় খ্রিস্টধর্মে দীক্ষালাভ করেছিলেন তারা পর্তুগীজদের প্রদত্ত পদবীই নিজের নামের সাথে যোগ করেছিলেন। তাই পর্তুগীজদের পদবী কস্তা, গমেজ, রোজারিও, পিরিচ, সুজা, কুইয়া, কোড়াইয়া, পালমা, দরেজ, পিউরীফিকেশন, আলমিদা, ক্রুজ এবং এ রকম আরো বহু পদবী এই এলাকায় প্রচলিত। ১৬০৮ খ্রিস্টাব্দে সুবাদার ইসলাম খাঁ ঢাকাকে সমগ্র বঙ্গের রাজধানীতে পরিণত করার পর থেকে বহু বিদেশী ব্যবসায়ীরা এ এলাকায় আসতে থাকে। পর্তুগীজ ব্যবসায়ীরা এইসময় ঢাকায় তাদের বসতি গড়ে তুলেন। ১৬১২ খ্রিস্টাব্দে আগস্টিনিয়ান ফাদারগণ ঢাকায় প্রথম খ্রিস্টধর্ম প্রবর্তন করেন। আর এই সময় ঢাকার আশে-পাশের এলাকা শ্রীপুর (ঢাকা জেলার সোনারগাঁও-এর মুন্সীগঞ্জ মহকুমার পদ্মানদীর তীরে অবস্থিত ছিল) লরিকূল (হাসনাবাদ ধর্মপল্লী থেকে ১০ মাইল দক্ষিণে পদ্মানদীর পাশে অবস্থিত ছিল) এবং কাত্রাবুতে (ঢাকা জেলার খিজিরপুরের বিপরীতে শীতলক্ষ্যা নদীর তীরে অবস্থিত) অনেকে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করে পর্তুগীজদের সাথে বসতি স্থাপন করেন। আবার অনেকে অন্যস্থানে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষালাভ করে এই সব অঞ্চলে এসে বসতি গড়েন।

ভাওয়াল অঞ্চলে সঠিক কোন্ খ্রিস্টাব্দে খ্রিস্টধর্ম প্রথম প্রচারিত হয়, প্রয়োজনীয় মূল তথ্যের অভাবে সঠিকভাবে এখনো তা উৎঘাটন করা সম্ভব হয়নি। তবে ফরিদপুরের ভূষণার রাজপুত্র দোম আন্তনীও দ্যা রোজারিও যে ভাওয়াল এলাকায় ১৬৬৩ খ্রিস্টাব্দের পরবর্তী সময়ে খ্রিস্টধর্ম প্রচার করেন তা জানা যায়। প্রথম জীবনে তিনি হিন্দু ধর্মাবলম্বী ছিলেন। মগ জলদস্যু দ্বারা বন্দি হয়ে তিনি ক্রীতদাস হিসাবে বিক্রি হন। কিন্তু ঘটনার পরিক্রমায় ফাদার মানুয়েল ডি'রোজারিও তাঁকে ক্রয় করে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষা দেন। দোম আন্তনীও কথাবার্তায় অসাধারণ ছিলেন। তাঁর কথা বলার কৌশলে অনেকে এমন অভিভূত হয়েছিলো যে, তারা খ্রিস্টধর্মে দীক্ষালাভ করেন। তিনি কথোপকথনের মাধ্যমে হাটে-বাজারে তর্ক-বিতর্কের মধ্যদিয়ে কাথলিক খ্রিস্টধর্মের পক্ষে প্রচুর সাফল্য লাভ করেন। পরবর্তীতে তিনি ঢাকার ভাওয়াল এলাকায় বাণীপ্রচার করতে আসেন। তাঁর রচিত সাধু আন্তনীর পালাগানসহ অন্যান্য পালা-গান ভাওয়াল ও রাজশাহী অঞ্চলের বাঙালি কাথলিকদের মধ্যে এখনও পরিদৃষ্ট হয়। তাঁর প্রচারের ফলে সেই সময় পূর্ববঙ্গে প্রায় ৩০-৪০ হাজার লোক খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেন। এছাড়াও তিনি ঢাকার দক্ষিণে হাসনাবাদ-গোল্লা এলাকায় বহু লোককে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষা দেন। যেহেতু তিনি একজন বাঙালি ছিলেন তাই সহজেই বাঙালির মন জয় করতে পেরেছিলেন। দোম আন্তনীও তাঁর প্রচারকাজের প্রসারতার জন্য ১২ জন কাটেখিস্ট বা ধর্ম শিক্ষক প্রস্তুত করেছিলেন যারা তাঁর প্রচারকাজে সহায়তা দান করেন। তাঁদের সহযোগিতায় তিনি বহু লোককে খ্রিস্টধর্মে আনতে সক্ষম হয়েছিলেন। বৃহত্তর ফরিদপুর জেলার পশ্চিমাংশে যে আঞ্চলিক বাংলা প্রচলিত তার সাথে ভাওয়ালের কাথলিকদের আঞ্চলিক বাংলার বেশ মিল লক্ষ্যণীয়। আবার দোম আন্তনীও যেহেতু ফরিদপুরের লোক ছিলেন তাই সেখান থেকে অনেক খ্রিস্টান লোক যে ভাওয়াল এলাকায় এসে বসতি স্থাপন করেছেন; এটা নিশ্চিত।

যারা খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত হন তারা বেশিরভাগই হিন্দু ধর্মের নিচু শ্রেণী থেকে আসা। আবার বেশ সংখ্যক মুসলমানও খ্রিস্টধর্মে দীক্ষা লাভ করেছিলেন। সেই সময় হিন্দু সমাজের মধ্যে জাতিভেদ প্রথা ব্যাপকভাবে শিকড় গেঁথে বসেছিলো। সমাজের যারা নিচু শ্রেণীর তাদের সাথে উঁচু শ্রেণীর লোকদের মেলামেশা ছিল

নিষিদ্ধ। তাদের মধ্যে বিবাহ, পূজা-অর্চনা, খাওয়া-দাওয়া, একই পুকুর থেকে জল আনা, গোসল করা এমনকি পেশার দিক থেকেও প্রভেদ লক্ষ্যণীয় ছিলো। যারা উঁচু শ্রেণীর তারা পূজার কাজ করবে আর নিচু শ্রেণীর লোকেরা উঁচু শ্রেণীর ভরণ-পোষণের কাজ করবে। নিচু শ্রেণীর হিন্দুদের মধ্যে বেশিরভাগেরই পেশা ছিল চাষা (কৃষক) চাড়াল (নমশূদ্র বা নিম্নবর্ণের লোক) ডোম, মুচি, জোলা (তাঁতি), জেলে, মেথর এবং নাপিতের কাজ করা। অনেকের মতে, যারা চাষা তাদের পূর্বপুরুষগণ মুসলমান ছিলেন। আবার জোলা বলতে মুসলমান তাঁতি বুঝায়। তাই ধারণা করা হয়, খ্রিস্টান সমাজে ব্যবহৃত এই নামের লোকদের পূর্বপুরুষরা হয়তো মুসলমান ছিলেন। আবার চাড়াল যেহেতু নিম্নবর্ণের হিন্দু; তাই হিন্দু থেকে তারা খ্রিস্টান হয়েছেন। নিচু শ্রেণীর হিন্দুরা চাইলেও কখনো উঁচুদের পেশা গ্রহণ করতে পারতো না। আর এটি ছিল সেই সময়কার ক্ষতিকর প্রথা। এতে করে নিচু শ্রেণীর লোকদের মধ্যে অসন্তুষ্টি ও রাগ ছিলো। ধর্ম যেহেতু মানুষকে বাঁচতে শিক্ষা দেয় তাই সেই সময় নাগরী ও বঙ্গের বিভিন্ন স্থানের নিচু শ্রেণীর লোকেরা খ্রিস্টধর্মের শ্রেণী ভেদাভেদহীন অমর বাণীর সংস্পর্শে এসে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষা নেন। এছাড়াও অনেকে ধর্মপ্রচারক যাজকদের দ্বারা বিভিন্নভাবে উপকৃত হয়ে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেন। এখানে দোম আন্তনীও দ্যা রোজারিও একটি জীবন্ত উদাহরণ।

১৬৬৩ খ্রিস্টাব্দ থেকে আগস্টিনিয়ান যাজকগণ ভূষণা রাজ্যের কোষাভাঙ্গায় প্রচার কাজ করতেন। সেখান থেকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা বিভিন্ন এলাকায় বাণীপ্রচারে যেতেন। সেই সময় নদী ভাঙ্গনের জন্য অনেকেই ছিলেন ভূমিহীন। প্রায়ই তারা জোতদারদের নানা অত্যাচারের শিকার হতেন। এমন অবস্থা দেখে ফাদার লুইস দস আঞ্জুস ১৬৯৫ খ্রিস্টাব্দে ঢাকার নিকটবর্তী ভাওয়াল পরগনার নাগরী গ্রামটি ক্রয় করে কোষাভাঙ্গার খ্রিস্টানদের সেখানে বসতি করান। এরপর নাগরী এবং পার্শ্ববর্তী এলাকা তুমিলিয়া, দড়িপাড়া, রাঙ্গামাটিয়া, মঠবাড়ীতে খ্রিস্টভক্তগণ ছড়িয়ে পড়তে থাকেন। মৌখিক ও প্রচলিত ইতিহাসে জানা যায় যে, জনমানবহীন এক বন ছিল বর্তমান নাগরীর পানজোরার সাধু আন্তনীর চত্বরটি। এ জমির মালিক ছিলেন নিঃসন্তান এক হিন্দু রমণী। একদিন তিনি স্বপ্নে দেখলেন কে যেন তাকে বলছেন তিনি যেন সম্পত্তি মিশনের নামে দান করে দেন। স্বপ্নের নির্দেশমতো তাঁর সমস্ত জমি তিনি দান করেন মিশনের নামে। তিনি খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করে ক্যাথরিন পিরিচ নাম গ্রহণ করেন। এছাড়াও তাঁর আত্মীয়-স্বজন অনেকেই পরবর্তীতে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেন।

১৭১২ খ্রিস্টাব্দের দিকে ফাদারদের মতে, বঙ্গে সেই সময় তিন ধরণের কাথলিকের বসবাস ছিলো- ক) কুঠি ও ব্যবসায়ে কর্মরত ইউরোপীয়গণ খ) ভাড়াটে সৈন্য (এরা মোঘল শাসকদের অধীনে কর্মরত খাঁটি পর্তুগীজ ও ভারতীয় সংমিশ্রণজাত সন্তান) গ) খ্রিস্টধর্মে দীক্ষাপ্রাপ্ত স্থানীয় জনগণ। এতে বুঝা যায় সেই সময় পর্তুগীজরা এদেশের নারী-পুরুষের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে আলাদা ধরণের মিশ্রিত সমাজ গড়ে তুলেছিলেন। পরবর্তীতে তাদের ঘরের সন্তানরা নিশ্চয় পর্তুগীজ পদবী গ্রহণ করেন এবং বঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েন। উল্লেখযোগ্য যে, বহু পর্তুগীজ সৈন্য, নাবিক ও ব্যবসায়ী পূর্ববঙ্গের স্থানীয় বাঙালি নারীদের বিয়ে করেন এবং তাদের সন্তানদের কাথলিক হিসাবে গড়ে তুলেন। এছাড়াও পর্তুগীজদের অধীনে বেশ কিছু সংখ্যক হিন্দু ও মুসলমান দাস-দাসী এবং চাকর-চাকরানী ছিল, যাদেরকে আগস্টিনিয়ান বাণীপ্রচারকগণ খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করেন। বর্তমান বাংলাদেশের পূর্ববঙ্গের উপকূলীয় অঞ্চলের খ্রিস্টানদের অনেকেই পর্তুগীজ-ইন্দো-পর্তুগীজদের বংশধর। আর ঢাকা অঞ্চলের অধিকাংশ খ্রিস্টানগণ নিম্ন হিন্দুদের বংশধর। ১৭২৫ খ্রিস্টাব্দে ফাদার আম্ব্রোজিও দ্যা সান্তো আগস্তিনো ভাওয়াল অঞ্চলের নাগরীর পাল-পুরোহিত ছিলেন। ১৭৫০ খ্রিস্টাব্দে তাঁর এক বিবরণীতে দেখা যায় যে, নাগরীতে ৬০০ বয়স্ক কাথলিক এবং ৬০০ শিশু-কিশোর ছিলো। তাছাড়া, এর আশে-পাশে ৯০০ বয়স্ক কাথলিক ছিলো। এই তথ্য কিছুটা ভুল হতে পারে। কারণ বয়স্ক ও শিশু-কিশোর কাথলিকের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু আরো অন্য বয়সের কাথলিক থাকার সম্ভাবনা কোন মতেই উপেক্ষা করা যায় না। তবে এটা সত্য যে, সেই সময় উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কাথলিক বসতি গড়ে তুলেছিলেন। ফাদার আম্ব্রোজিও তাঁর বিবরণীতে গুপ্ত খ্রিস্টানত্বের কথাও উল্লেখ করেন। গুপ্ত খ্রিস্টানগণ পূর্বে ইসলাম ধর্মাবলম্বী ছিলেন। ফাদার আম্ব্রোজিও প্রতিবছর ৩০০ ব্যক্তিকে গুপ্ত দীক্ষাস্নান দিতেন। ১৮৬২ থেকে ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে বিশপ দ্যুফালের শাসনামলটি ছিল তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ এই সময় অনেকে কাথলিক মণ্ডলীভুক্ত হয় এবং হাজার হাজার শিশু দীক্ষাস্নান লাভ করে। তবে বাণীপ্রচারকদের অবিরাম প্রচেষ্টা সত্ত্বেও ধর্মান্তরিত ব্যক্তিদের সংখ্যা ছিল স্বল্প। ১৮৬২ থেকে ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত হিন্দুদের মধ্য থেকে কাথলিক মণ্ডলীভুক্ত ধর্মান্তরিত ব্যক্তিদের বার্ষিক সংখ্যা ছিল ৩০ থেকে ৪০ জন এবং মুসলমানদের মধ্য থেকে ১২ জন। তাছাড়া বছরে প্রায় ৩৫টি মরণাপন্ন হিন্দু শিশুকে দীক্ষাস্নাত করা হতো।

ভারতীয় উপমহাদেশে সেই যে পতুর্গীজদের মধ্য দিয়ে ব্যবসা বানিজ্যের সূত্রপাত হয়েছিলো এরপর আরো বহু বণিক সম্প্রদায়ের এদেশে আগমন ঘটে। বিশেষভাবে ফরাসি, ওলন্দাজ, আর্মেনীয় ও ব্রিটিশরা এদেশে ব্যবসা-বাণিজ্যের সাথে লিপ্ত ছিলো। এখনো বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে তাদের সেই চিহ্ন ইমারত, কবর, গীর্জা স্বগৌরবে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু পতুর্গীজরাই শুধুমাত্র খ্রিস্টবাণী প্রচার ও প্রসারের কাজে সফলতা দেখিয়েছে। বাংলাদেশে বাঙালি খ্রিস্টানরা যতোদিন রয়েছে পর্তুগীজদের অবদান কখনো ভুলতে পারবে না। রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের দক্ষিণ ভিকারিয়ার ছয়টি ধর্মপল্লীর বাঙালিরা আজ সেই ইতিহাসের পাণ্ডুলিপির সাথে জড়িত। চাইলেও আমাদের যে ইতিহাস তা কখনো এড়িয়ে যেতে পারবো না। ১০০ বছর পূর্বে খ্রিস্টভক্তবিশ্বাসীগণ গাজীপুরের শীতলক্ষা তীরের ভাওয়াল এলাকা ছেড়ে বড়াল-চলনের অববাহিকায় এসে বসতি গড়ে তোলেন। আজ শতবর্ষের পূর্তি উৎসবের দ্বারে দাঁড়িয়ে আমরা বর্তমান প্রজন্ম। ঐতিহাসিক একটি মাহেন্দ্রক্ষণ ও ঘটনার সাক্ষী হতে যাচ্ছি। শতবর্ষ পূর্বে পূর্বপরুষগণ যেমন খ্রিস্টবিশ্বাসকে আকড়ে ধরে বাঁচতে চেয়েছিলেন ঠিক তেমনি সেই একই বিশ্বাসকালের পরিক্রমায় পরবর্তী প্রজন্ম ধরে রেখেছে। এখনো এই সময়ে খ্রিস্টবিশ্বাসের সাক্ষ্য আমরা কোন না কোনভাবে বহন করে চলেছি। পূর্বপুরুষগণ কোন রকম উচ্চ প্রত্যাশা ছাড়া শুধুমাত্র সামাজিক ও ধর্মীয় কুপ্রথা, শ্রেণীবিবাদ, নির্যাতন-অত্যাচার ও অবহেলা থেকে মুক্ত হবার প্রয়াসে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন। তাই আমাদের গর্ব করার মতো অনেক কিছু রয়েছে। কারণ আমাদের পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে পাওয়া খ্রিস্টবিশ্বাসের অগ্নিশিখা এখনো প্রজ্বলিত। এদেশেরই বঙ্গসন্তান আমাদের রক্তের রক্ত, অস্থির অস্থি পূর্বপুরুষগণ। তাই আমাদের যে শিকড়ের ইতিহাস তা যেন ভুলে না যাই; বরং গর্বভরে প্রকাশ করি সত্যিকার ইতিহাস। জয়তু, হে পূর্বপুরুষগণ, খ্রিস্টপতাকাবাহী অমর॥

কৃতজ্ঞতাস্বীকার

১। *দত্ত, ডেনীস দিলীপ: বাংলা চার্চের ইতিহাস (সৃষ্টি থেকে ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দ), সাহিত্য বিভাগ, চট্টগ্রাম, ১৯৯২।*

২। *কস্তা, ডি যেরোম: বাংলাদেশে কাথলিক মণ্ডলী (প্রথম খণ্ড), প্রতিবেশী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৮।*

৩। *প্রদীপ স্ট্যানলী গমেজ এসিএমএ., ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের ভাওয়াল অঞ্চলের ছয়টি ধর্মপল্লীর ইতিবৃত্ত, আর্চবিশপীয় অধিষ্ঠান ও কৃতজ্ঞতা স্মরণিকা, ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশ, ২০০৫ খ্রিস্টাব্দ, পৃষ্ঠা- ৯৮-১১০।*

৪। *রিসার্স পেপারস্, ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাস (সম্পাদনা ফাদার দিলীপ এস. কস্তা)- ২০০৬ খ্রিস্টাব্দ।*

৫। *রিসার্স পেপারস্, ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাস (সম্পাদনা ফাদার দিলীপ এস. কস্তা)- ২০০৮ খ্রিস্টাব্দ।*

৬। *রিসার্স পেপারস্, ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাস (সম্পাদনা ফাদার দিলীপ এস. কস্তা)- ২০১০ খ্রিস্টাব্দ।*

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শই হোক আমাদের চলার পথের পাথেয়

মেজর (অবঃ) বিজয় ম্যানুয়েল ডি'প্যারেস

হে বঙ্গবীর তোমার এই শতবর্ষে তোমাকে জানাই লাখো কোটি সালাম। তোমার জন্ম না হলে, এই বাঙালি জাতির জাতিসত্ত্বাই সুদৃঢ় হতো না, তোমার জন্ম না হলে পৃথিবীর বুকে বাঙালিরা মাথা উঁচু করে বাঁচতে পারতো না, হয়তো বা বাঙালি জাতির অস্তিত্বই টিকে থাকতো না। তাই তো জানাই এদেশের আপামর জনগণের পক্ষ থেকে আবারও প্রাণঢালা ফুলেল শুভেচ্ছা। তোমার মত মনীষী এই বাংলায় জন্মেছে বলেই বাংলার মাটিও মানুষ আজ ধন্য।

বৈষয়িক দৃষ্টিতে তুমি হয়তো ক্ষণজন্মা হয়ে আমাদের মাঝে এসেছিলে আশীর্বাদ রূপে। হে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ সন্তান, তুমি হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি। তুমি বাঙালি জাতির গর্ব, তুমি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু। তাই কবির সুরে যদি বলি, যতদিন পৃথিবীতে উঠবে চন্দ্র-সূর্য্য, যতদিন রবে পদ্মা, মেঘনা, যমুনা বহমান-ততদিন এই বাংলায় বেঁচে থাকবে তুমি, বঙ্গবন্ধু "শেখ মুজিবর রহমান"।

ঐশ করুণা বলে, মহান সৃষ্টিকর্তার কৃপায় যে নারীর গর্ভ ধারণ করেছিলো তোমায়, সে নিসন্দেহে রত্নগর্ভা জগৎ জননী মাতা। মা তুমি ছিলে নারীকুলে ধন্যা। হে জগৎ জননী রত্নগর্ভা মাতা একদিন তোমার কোলজুড়ে আলোকিত করে যে সন্তানটি শেখ মুজিব নামে এই পৃথিবীতে ভূমিষ্ট হয়েছিল, আজ তুমি দেখে যাও, তোমার সেই ক্ষণজন্মা সেই ছোট শিশুটি তোমার সোহাগ ও স্নেহে বড় হয়ে এই বাঙালি জাতিকে এক দীর্ঘ রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্যদিয়ে দেশকে পরাধীনতার শৃংখল থেকে মুক্ত করেছে এবং স্বাধীন করে একটি লাল+সবুজের পতাকা জাতিকে উপহার দিয়েছে। শুধু তাই নয়, তোমার আমার সেই মুখের ভাষা বাংলাকে পৃথিবীর বুকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে। আজ এই মুজিব শতবর্ষের শুভ জন্মদিনে মা তোমার মত আর এক মহিয়ষী নারীর কথা না বললেই নয়। যিনি জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর জীবনে জীবন সঙ্গিনী হয়ে না আসলে বঙ্গবন্ধুর জীবন আলোকিতই হতো না, হয়তো বা পরিপূর্ণতাও পেতোনা। আপনারা এতক্ষণে নিশ্চয়ই বুঝে গেছেন আমি যার কথা বলছি, তিনি আর কেউ নন, তিনি হলেন শেখ পরিবারের পরবর্তী আর এক রত্নগর্ভা মাতা বঙ্গবন্ধুর সহধর্মিনী যিনি এই বাংলায় "বঙ্গমাতা" নামে সুপরিচিতা, বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব। যিনি ছিলেন বঙ্গবন্ধুর সকল বিপদে আপদে সার্বক্ষণিক সহচারিণী এবং তার আষ্টেপৃষ্টে বাধা এক রমনী। একদিন হয়তো আশা-ভরসা নিয়ে এই মুজিব পরিবারে এসেছিলেন নববধূর সাজে। সমাজের অন্যান্য নারীদের মত তিনিও দাম্পত্য সুখের স্বপ্ন দেখেছিলেন। সত্যি তার কপালে সেইভাবে সুখ বেশি দিন থাকেনি।

বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক আদর্শের কারণে, জীবনের বেশিরভাগ সময়ই বিভিন্ন কারাগারে কষ্টে কেটেছে। ফলে, স্ত্রী হিসাবে পারিবারিক সুখের বদলে ত্যাগ ও অপেক্ষায় দিন-যাপন করতে হয়েছে দিনের পর দিন। তারপরেও তিনি হাল ছাড়েননি, বরং ত্যাগের মহিমায় উজ্জীবিত হয়ে তিনি মেনে নিয়েছিলেন জীবন উৎসর্গের এই মহান ব্রত। বঙ্গবন্ধুর সেই দুর্দিনে সন্তানদের তিনি বুকে আগলে ধরে রেখেছিলেন আর শত বাঁধা বিপত্তি সত্ত্বেও এখানে-সেখানে খেয়ে না খেয়ে স্বৈরাচারী সরকারী অনুচরদের ভয়ে লুকিয়ে-লুকিয়ে বহু দিন কাটিয়েছেন। সমস্ত সুখ, শান্তি, ভোগবিলাসী জীবন বিসর্জন দিয়ে ত্যাগের পথ বেছে নিয়েছেন। স্বাধীনতার ইতিহাস এত সহজ নয় আর এত সহজে তা আসেনি, এ প্রজন্মের সন্তানেরা তাই উপলব্ধি করতে পারছে না। আমরা দেখেছি ও শুনেছি, এমনকি তিনি ঘরে নিজেদের জন্য রান্না করা খাবার না খেয়ে বঙ্গবন্ধুর সাথে হঠাৎ করে আসা নেতা-নেতৃদেরকে খাইয়েছেন। তাই তো বঙ্গবন্ধুর সাথে থেকে জনগণকে সাহায্য সহযোগিতা এবং সন্তানের মতো ভালোবেসে ধীরে-ধীরে একদিন এদেশের মানুষের কাছে বঙ্গমাতা হয়ে উঠলেন। আর বঙ্গবন্ধু হলেন, জাতির পিতা। এ ধরনের উপাধি এমনি এমনি পাওয়া যায় না। অনেক ত্যাগ তিতীক্ষা ও রক্ত ঝড়ানোর পরই এ ধরনের উপাধি ভাগ্যে মিলে। পৃথিবীর মতো বিশাল বড় একটি মন ছিল বঙ্গবন্ধুর আর সেই মনের গভীরতা ছিল সমুদ্রের মতো।

জাতির পিতা "বঙ্গবন্ধু ও বঙ্গমাতা" ফজিলাতুন্নেছা মুজিব কি জানতেন? তারই ঔরসজাত সন্তানরা তাদেরই আদর্শে বড় হয়ে একদিন তাদের স্বপ্নে লালিত অসমাপ্ত কাজগুলো সমাপ্ত করার লক্ষ্যে দেশ পরিচালনার দায়িত্ব হাতে তুলে নিবেন। আজ যদি তারা কেউ বেঁচে থেকে দেখে যেতে পারতেন, তাহলে হয়তো গর্ব করে বলতেন ওরে, পৃথিবীর মানুষ তোরা দেখে যা, আমাদেরই সুযোগ্য সন্তানরা আজ সোনার বাংলা সোনায় পরিণত করতে চলেছে সেদিন আর বেশি দূরে নয়। স্বৈরাচারী পাকিস্তানী রাজাকার সমর্থিত অপশক্তি, তোরা হাজার চেষ্টা করেও আমাদের সন্তানদের এবং বাংলার মেহনতি মানুষকে পরাস্থ করতে পারিসনি, তারা এই সোনার বাংলাকে উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। ধন্য তুমি বঙ্গবন্ধু, ধন্য হে তোমার সহধর্মীনি রত্নগর্ভা মহিয়ষী বঙ্গমাতা। আজ তোমার মতই তোমার সুযোগ্যা কন্যা শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা তোমার পদাংক অনুসরণ করে তোমার মতই রত্নগর্ভা মহিয়ষী নারী হিসাবে বাংলায় আর্বিভূত হয়েছেন। তাদের যোগ্য সন্তানেরাও সুশিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে বিশ্ব নেতৃত্বে সমান তালে অবদান রেখে চলেছেন। একজন শেখ রেহানার কন্যা নতুন প্রজন্ম নারী নেত্রী শেখ টিউলিপ রহমান ইংল্যাণ্ড থেকে সরাসরি বিশ্ব নেতৃত্বে ভূমিকা রাখছে। আর এক নতুন প্রজন্ম বিশ্বখ্যাত জননেত্রী মাদাম হিউমিনিটিস্ পুরুস্কার প্রাপ্ত মাননীয় প্রদানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুযোগ্য পুত্র সজীব ওয়াজেদ সুদুর আমেরিকায় বসে দাদু বঙ্গবন্ধুর লালিত স্বপ্ন সোনার বাংলা সোনায় পরিনত করা ও তার অসামাপ্ত কাজগুলি সমাপ্ত করার কাজে মায়ের সঙ্গে সমান তালে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার কাজে নিমগ্ন রয়েছেন। বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা বলেই নারী নেত্রী হিসাবে বিশ্বে জাগরণ তুলতে পেরেছেন এবং মাতৃভাষা বাংলাকে আজ তারই প্রচেষ্টায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা হিসাবে বিশ্বে স্বীকৃতি পেয়েছে। সেটাও ছিল পিতারই স্বপ্ন।

প্রিয় পাঠক-শ্রোতা, আমার বলার অপেক্ষা রাখে না। তাই আজ সত্যি কথাটি বলতে দ্বিধা নেই। কবি জীবনানন্দ দাশের এই রূপসী বাংলায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আজ উন্নয়নের জোয়ার বইছে। আমি বঙ্গবন্ধুর একজন আদর্শ সৈনিক বীর মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তার সানিধ্যে যাওয়া ও তার সাথে কথা বলার সৌভাগ্য হয়েছিল কয়েকবার। আমার কাঁধে হাত রেখেছিলেন বঙ্গবন্ধু তিনি, বিশাল বড় মনের মানুষ ছিলেন আমি আগেও বলেছি একেবারে কাছে না গেলে বুঝা যায় না। ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে ১০ জানুয়ারি যখন "বঙ্গবন্ধু" পশ্চিম পাকিস্তান থেকে কারাবন্দী জীবন কাটিয়ে হেলিকপ্টার যোগে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সাথে এসে স্বাধীন বাংলার মাটিতে পা রাখলেন, সে সময় ঢাকার এই ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানে এবং তার আশেপাশে উচুঁ উচুঁ গাছপালা এবং দালান-কোঠার ছাদে তিল ধারণের জায়গাটি পর্যন্ত ছিল না। ঢাকা শহরে শুধু মানুষ আর মানুষ। এই প্রিয় মানুষটির মুখ সামনে থেকে এক নজর দেখার জন্য বাংলার গ্রাম-গঞ্জ হতে ২-৩ দিন আগে থেকে লোকজন ঢাকায় গণ জমায়েত হচ্ছিল। শুধুমাত্র একটি গুজবের ওপর ভিত্তি করে যে, "বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে" পাকিস্তান সরকার বিশ্ব নেতৃবৃন্দের প্রচণ্ড চাপের মুখে আগামী ২/৪ দিনের মধ্যে কারাগার হতে মুক্তি দিচ্ছে এবং ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে দেশে ফিরছেন। বঙ্গবন্ধুর মুক্তির বিষয়টি পাকিস্তান থেকে আসার ২ দিন আগে ভারত সরকার বাংলাদেশকে নিশ্চিত করেছিল। তার আগে মুক্তির বিষয়টি "গুজব" ছিল। বঙ্গবন্ধু তিনি পশ্চিমা স্বৈরাচারী সরকারকে বলেছিলেন, শহীদের রক্তের তথা বাংলার মানুষের রক্তের উপর দিয়ে হেঁটে তিনি পশ্চিমা স্বৈরশাসকদের ডাকা কনফারেন্সে অংশগ্রহণ করবেন না। বঙ্গবন্ধু কোনদিন মৃত্যুকে ভয় পেতেন না। সেদিন প্রথমে হেলিকপ্টার থেকে নেমেই হাঁটু গেরে বাংলার মাটিকে চুম্বন করলেন এবং অশ্রুস্বজল চোখে কান্নায় ভেঙ্গে পরলেন। তারপর তিনি হাজার-হাজার মানুষের ভীড় ঠেলে কেন্দ্রিয় নেতৃবর্গের সঙ্গে রেসকোর্স ময়দানে প্রবেশ করলেন এবং বঙ্গবন্ধু দুইহাত বাড়িয়ে দিলেন। আমার সৌভাগ্য হয়েছিল সেদিন তিতুমীর কলেজের অন্যান্য ছাত্র বন্ধুদের সাথে প্রবেশ মুখে যাবার রাস্তায় দাঁড়িয়ে আমি বঙ্গবন্ধুর সাথে বুক মিলিয়ে অভিবাদন জানিয়েছিলাম আজও সেদিনের কথা মনে হলে গর্বে বুক ভরে যায়। আমাদের দাঁড়িয়ে থাকা সবার মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন "বাবারা বেঁচে থাক, তোমরাই দেশের ভবিষ্যৎ, আমাদের সামনে কিন্তু অনেক কাজ করতে হবে" তাই তো এখন সেই দৃশ্যের কথা মনে হলে তার স্পর্শ এখনো অনুভব করি। তারপর তিনি সুউচ্চ মঞ্চের দিকে যেতে থাকলেন ও একসময় অনেক কষ্টে মঞ্চে ওঠে ঘন্টার পর ঘন্টা অপেক্ষারত লাখো মানুষের উদ্দেশে অশ্রুসিক্ত ও কান্নাজড়িত কণ্ঠে ভাষণ দিলেন। সেই ভাষণে তিনি কি বলেছিলেন তা আপনারা সকলেই জানেন, আমার বলার আর অপেক্ষা রাখে না। তাই মুজিব শতবর্ষে আপনাদের আহ্বান জানিয়ে বলতে চাই, আসুন আমরা জাতির পিতার আদর্শকে লালন ও ধারণ করে তারই সুযোগ্যা কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে ডিজিটাল সোনার বাংলা গড়ার কাজে অংশগ্রহণ করে তার হাতকে শক্তিশালী করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু, জয় হোক মেহনতি মানুষের॥

মায়ের স্মৃতি

ঝুটন জন কস্তা

আগামীকাল পহেলা বৈশাখ। আমার জীবনের একটি বিশেষ দিন। আজ হতে ৩২ বছর আগে ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দের এই দিনে মা আর আমি মতিঝিল ব্যাংক কলোনী থেকে নদ্দা চলে আসি ছোট্ট দুই রুমের টিনশেড একচালা ঘরে। ছিলো না বিদ্যুত, গ্যাস আর ট্যাপের জল। চারিদিকে প্রচুর গাছ গাছালি ভরা। রাতের অন্ধকারে খুব ভয় লাগতো, বলতে গেলে গ্রামের বাড়ি। বাসার সামনের রাস্তা দিয়ে মহিসের গাড়ি ধান নিয়ে যেতে দেখেছি। অনঅভ্যস্ত পরিবেশ মায়ের আর আমার খুব কষ্ট হচ্ছিল। ধীরে ধীরে আমরা অভ্যস্ত হয়ে পড়ালাম গ্রামের এই পরিবেশে। বিদ্যুতের সংযোগ নিয়ে আসলাম, টিউবওয়েল বসালাম, কেরোসিনের স্টোভ করলাম। শুরু হলো নতুন জীবন। নদ্দা থেকে গুলশান হয়ে মতিঝিল অফিস যাওয়া আর ফিরার পথ মতিঝিল থেকে রামপুরা টিভি মোড় মুড়ির টিন বাসে করে এসে, হেঁটে খাল পার হয়ে রিকশা করে বাসায়। রাস্তার দুপাশে শুধু খোলা মাঠ আর গাছ গাছালিতে ভরা।

খাবার খেতে কষ্ট হতো, কারণ কেরোসিনের চুলায় রান্না গন্ধ নাকে লাগে। টিউবওয়েল চেপে জল তোলা ভীষণ কষ্ট হতো আমাদের।

নিজেদের আমরা বদলাতে শুরু করলাম। বাড়িটাকে আস্তে-আস্তে সম্পূর্ণ করলাম, সামনে মুরগির ঘর করালাম, সব্জির বাগান, ফুল বাগানও করলামও। নারিকেল গাছ ৪টি ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দে লাগিয়ে ছিলাম। কাজি পেয়ারা, কলা গাছ, ডালিম গাছও লাগালাম।

ধীরে-ধীরে বাড়িটা একটি মায়াবী হয়ে গেল।

মা এ বাড়ি, ও বাড়িতে ঘুরতে বেড়িয়ে পড়াতো। আমি অফিস থেকে বাসায় এসে অনেক সময় মাকে বাসায় পেতাম না, খুঁজতে বেরিয়ে পড়তাম মা কাদের বাড়িতে গিয়েছে। মা নদ্দায় এসে নিজের নতুন একটি যেন জীবন পেয়েছে।

নিজেই বাজার করতো নিজের পছন্দ অনুযায়ী গ্রামের বাজার থেকে। মায়ের হাতের রান্না ছিলো অসাধারণ, তার কাছেই আমার রান্না শিক্ষা।

তাই প্রতি পহেলা বৈশাখ আমি আর মা পালন করতে শুরু করি সেই থেকে। পহেলা বৈশাখে মায়ের প্রিয় ছিল পান্তা-ইলিশ। সকালে মা পান্তা ভাত, কড়া ইলিশ ভাজা, মরিচ পোড়া, চ্যাপা শুটকি ভর্তা, চাক বেগুন ভাজা, কাঁচা মরিচ, চাক পেঁয়াজ। যতো দিন মা জীবিত ছিলেন, এর ব্যতিক্রম হয়নি। গতবছর করতে পারিনি, এবারও করতে পারছি না। মাকে ছাড়া পহেলা বৈশাখ ভাবতে কষ্ট লাগে, এই বৈশাখেই মাকে নিয়ে আমার নতুন ঘর বাঁধা শুরু হয়েছিল। বৈশাখ আসবে আবার চলে যাবে, কিন্তু আবারও আসবে। কিন্তু মা তো আমার আর ফিরে আসবে না। এখন শুধু হৃদয়ের গভীরে থাকা সোনালী দিনের স্মৃতিগুলো মনের পর্দায় ভাসে। মা কে বলে তুমি নেই, তুমি আছো আমার ভালোবাসায় চির জাগ্রত॥

আমার না পাওয়ার গান

রকি রায়

সবেমাত্র ডাক্তারিটা পাস করেছি তাই আর ঘরে বসে থাকতে চাইলাম না। কাজের স্থান হিসেবে বেছে নিলাম একটি গ্রামকে। আমার নতুন ও প্রথম কর্মস্থল হলে দিনাজপুর শহর থেকে ৩৫ কি:মি: ভিতরে চিন্তামনি কমিউনিটি ক্লিনিক। সবার একই প্রশ্ন ঢাকা ছেড়ে মা-বাবা ছেড়ে এতো দূরে কেন? সবার সব প্রশ্নের উত্তর দেইনি, উত্তর দেওয়ার প্রয়োজনও বোধ করিনি। মাও প্রথমে একটু বেকে বসেছিল। একলা মেয়ে মানুষ, কেন এতদূরে যাবি? একটু অপেক্ষা করলে এখানে একটা চাকুরী জুটতো না। বাবার সমর্থনটাই আমাকে সবচেয়ে বেশি সাহায্য করছে। থাকাও খাওয়ার ব্যবস্থাটা বাবা নিজেই সুনিপুনভাবে সম্পন্ন করেছে। আমি এখানে একটা সাঁওতাল গ্রামে থাকি, বাবার কলেজ জীবনের বন্ধু সিরিল মুর্মুর বাসায়। বাবা আর সিরিল কাকা একসাথে নটরডেম কলেজে লেখাপড়া করেছে। সিরিল কাকা এখানকার একটি সরকারি প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক। তার পরিবারে তার স্ত্রী, দুই মেয়ে ও এক ছেলে আছে। বড় ছেলে ও মেয়ে দিনাজপুরে লেখাপড়া করছে। বর্তমানে সিরিল কাকার বাড়িতে সিরিল কাকা তার স্ত্রী, ছোট মেয়ে সুরুজমনি আর আমি থাকি। এই বাড়ি থেকে আমার ক্লিনিক পায়ে হেঁটে ২০ মিনিটের পথ। শহরের আনাচে-কানাচে ডাক্তারদের সহজলভ্যতা এবং সেই সব ডাক্তারদের ভিড়ে নিজেকে হারিয়ে ফেলতে চাইনি বলেই আমি আজ এই গ্রামে। গ্রামের এই সহজ-সরল মানুষগুলোকে সেবা দিয়ে হৃদয়ে এক অনন্য তৃপ্তি অনুভব করি। তাদের অকৃত্রিম ভালবাসা এবং হাসিমাখা মুখ আমায় প্রতিনিয়ত বিস্মিত করে। আজ গ্রামের হাটের দিন বিকেলে রোগির চাপ ছিল না। তাই তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে এলাম। দূর থেকে মাদলের তালে সাঁওতালী গানের সুর ভেসে আসছে। আমি সুরুজমনিকে ডেকে কারণ জানতে চাইলে ও বলল, আজকে শনতি দিদির মাড়োয়া কালকে ওর বিয়ে। সিরিল কাকা আমাকে বুঝিয়ে দিলেন মাড়োয়া হল সাঁওতালদের গায়ে হলুদের অনুষ্ঠান। সুরুজমনি আমাকে বলল, চল না ডাক্তারদি, ওদের বাড়ি থেকে ঘুরে আসি। আমার নাম অবনী এই দশ বছরের মেয়েটা আমায় অবনীদি না বলে রোগিদের মত ডাক্তার দি বলেই ডাকে, ওর মুখে এই ডাক আমারও বেশ ভালো লাগে। আমি সুরুজ মনিকে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে বলে গোসল করতে গেলাম। গোসল শেষে আমার এই ক্ষুদ্র পথপ্রদর্শকের হাত ধরে রওনা হলাম শনতিদের বাড়িতে। বিয়ে বাড়ির যতো কাছে এগিয়ে যাচ্ছিলাম মাদল ও গানের সুর ততো স্পষ্ট হয়ে উঠছিল। বিয়ে বাড়িতে পৌছানো মাত্র একজন অল্প বয়সের যুবক আমাদের দুটো চেয়ার এনে দিল বসার জন্য। সাঁওতাল কৃষ্টি অনুসারে আমাদের স্বাগতম জানাল এবং চা পান করতে দিল। আমার কাছে এই সহজ-সরল আতিথেয়তা বেশ ভালো লাগল। মান্ডোয়া বা গায়ে হলূদ অনুষ্ঠান শুরু হল একপাশে কয়েকজন মহিলা সাঁওতালী ঢঙ্গে নাচ গান করছে দুজন পুরুষ তাদের মাদল বাজিয়ে সাহায্য করছে। সাঁওতালী ভাষার গান গুলো আমি ঠিক বুঝতে না পারলেও গানের সুরগুলো ভীষণ ভালো লাগছিল। হঠাৎ সাঁওতালী ঢঙ্গে বাংলা কথার একটা গান গাইতে শুরু করল ওরা

ছোটবেলার ভালবাসা আমার বিয়ের সময় কাদিস নারে,

জান দেব, প্রাণ দেব এক ফোঁটা রক্ত দেব

আমার বিয়ের সময় কাদিস্

আমার বিয়ের সময় কাদিসনারে।

গানের কথাগুলো আমায় একটু আবেগী করে তুলল। ছোটবেলার ভালবাসা কি সত্যিই কাঁদায়? গানটা আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে গেল দশ বছর পিছনে। তখন আমি অষ্টম শ্রেণিতে পড়ি। বার্ষিক পরীক্ষা শেষ হলে মা বাবা আর আমি বড়দিন করতে যায় বাবার মামাতো বোন কনিকা পিসির বাড়ি ঢাকা কালিগঞ্জের দড়িপাড়াতে। মা-বাবা এখানে আগে আসলেও আমার ছিল প্রথমবার। পিসির একমাত্র ছেলে কনকদা বিদেশে থাকতো। পিসি ও পিসির ভাসুরের পরিবার থাকতো ঐ বাড়িতে। পিসির ভাসুরের এক ছেলে এক মেয়ে। মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে আর প্রীতমদা মানে পিসির ভাসুরের ছেলে বাড়িতে থেকে ডিগ্রি পড়ত। বাড়িতে আর কোন ছোট ছেলে-মেয়ে না থাকায়, ছুটির ঐ কটা দিন আমায় নিয়ে ঘুরে বেড়াবার দায়িত্ব পিসি দিল প্রিতমদার ওপর। প্রিতম দা ছিল একটু লাজুক প্রকৃতির, কম কথা। প্রায় প্রতিদিন বিকেলে আমি আর প্রিতমদা ঘুরতে যেতাম। কখনো বা রেললাইন ধরে সোজা পথ ধরতাম তুমিলিয়ার দিকে কখনো বা বিলের মাটির রাস্তা দিয়ে রাঙ্গামাটিয়ায়। আমি বিভিন্ন প্রশ্ন করে প্রিতম দার মাথা ধরিয়ে দিতাম। আচ্ছা দাদা, তুমি সাইকেল চালাতে পার? তুমি কি সিগারেট খাও? তুমি কার সাথে প্রেম কর? প্রিতমদা নীরবে আমার দিকে তাকিয়ে হাসত। গ্রামে প্রতি সন্ধায় যুবক যুবতীদের সাথে কীতন গাইতে যেতাম আমরা, প্রিতম দা বড়দিন উপলক্ষে গির্জা সাজাতে যেত তখনও ওর পিছু ছাড়তাম না আমি। প্রিতম দার সাদা মাটা চেহারা, ফিন ফিনে পাতলা ঠোঁটের হাসি, গালভরা চাপদাড়ি, চশমার মধ্যে দিয়ে শান্ত চোখের চাহনি আমার হৃদয়ে প্রীতমদার জন্য এক মায়া, এক আসক্তি সর্বোপরি এক ভালবাসার সৃষ্টি করে।

বড়দিন চলে গেলো, আমার স্কুল শুরু হতে তখনো এক সপ্তাহ বাকি কিন্তু বাবার অফিস শুরু আগামী পরশুদিন থেকে। তাই আগামীকালই ঢাকা ফিরে যেতে হবে আমাদের।

মা সন্ধাবেলায় ব্যাগ গোছাতে শুরু করল পিসি আর প্রিতমদার মা রান্না-ঘরে পিঠা বানাচ্ছে। বাবা, পিসা ও প্রিতমদার বাবা বাজারের দিকে গেছে, প্রিতমদা ওর ঘরে বই পড়ছিল। আমি নিশব্দে ওর ঘরে ঢুকে পিছন থেকে ওর গলা জড়িয়ে ধরি ও আস্তে করে আমার হাত দুটো ছাড়িয়ে নিয়ে আমাকে ওর টেবিলের পাশে এনে দাঁড় করাল, জিজ্ঞাসা করল, কাল চলে যাবে তোমরা? আমি উত্তর দিলাম, হ্যাঁ। দুইজনেই কিছুক্ষণ নীরব ছিলাম। আমি নীরবতা ভেঙ্গে বলে উঠলাম প্রিতমদা আমি তোমায় ভালবাসি। প্রিতমদা বই থেকে চোখ দুটি আমার দিকে তুলল। আমি আবারও বললাম, ভালবাসি তোমাকে। বরাবরের মত প্রিতমদা নীরবে হেসে উঠল, ওর ঐ হাসির অর্থ আমার বোধগম্য ছিল না। আমি প্রশ্ন করলাম, আর তুমি? প্রীতমদা উত্তর দিল অবনী তুমি আমার বোন অন্যদিকে আমার থেকে বয়সেও অনেক ছোট। তুমি যেটাকে ভালবাসা বলছ এটা ভালবাসা নয় সাধারণ মোহ একটা ক্ষীণ আর্কষণ। তুমি বাড়ি ফিরে যাও দেখবে এই মোহটা কেটে যাবে। পিসি রান্না-ঘর থেকে ডাক দিল অবনী গরম পিঠা খাবি আয়। সেই রাতে আর কিছু খেলাম না। পরদিন সকালবেলা পিসির বানানো গত রাতের গরম পিঠা ঠান্ডা হয়েছিল ঠিকই কিন্তু আমার দগ্ধ মন তখনো ঠান্ডা হয়নি। সবার কাছ থেকে বিদায় নিলাম। প্রিতম দা আমাদের বাসে উঠিয়ে দিতে এসেছিল বাসে উঠার আগে ও আমাকে বলল পড়াশুনায় মন দিও, সব ভুলে যাবে আর ভালো থেকো। আমি বললাম প্রিতম দা আমি সত্যিই তোমায়, প্রিতম দা আমাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, বললাম তো সত্যিই ভুলে যাবে। সেদিন বাড়ি ফিরে এসেছিলাম, সাথে নিয়ে, এসেছিলাম এক বুক ব্যাথ্যা। আর আমার মনে সদ্য জন্ম নেওয়া অস্পৃশ্য ও অদৃশ্য ভালবাসা নামক অনুভূতিকে। প্রিতমদার সাথে কাটানো সেই সুন্দর মুহূর্তগুলোর স্মৃতি। আর সেই সন্ধ্যাবেলায়, আমার না পাওয়ার গান।

সুরুজমনি হাত ধরে বলল বাড়ি চল ডাক্তার দি, হু: একটু চমকে উঠলাম নিজের অজান্তেই চোখের কোণে এক ফোঁটা জল জমেছিল। বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে মুছে ফেললাম। বললাম চল যাই। গত ছয় বছর মানুষের রক্ত মাংস, হাড়, শিরা উপশিরা নিয়ে পড়তে ও ব্যাস্ত থাকতে গিয়ে নিজের চোখের জল হারিয়ে ফেলতে বসে ছিলাম। আজ আবারও তার দেখা মিললো।

শুনেছি প্রিতম দার বিয়ে হয়ে গেছে। তখন সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত। সুরুজ মনির হাত ধরে পথ ধরেছি বাড়ির দিকে মৃদু হাওয়া বইছে, ঝিঁ-ঝিঁ পোকা ডাকছে, মাদল ও গানের সুর তখনো ভেসে আসছে।

জান দেব, প্রাণ দেব এক ফোটা রক্ত দেব

আমার বিয়ের সময় কাদিস্

আমার বিয়ের সময় কাদিস নারে।

পোপ ফ্রান্সিসের প্রৈরিতিক পত্র : 'এক পিতার হৃদয় দিয়ে' এর আলোকে ধারণাপত্র ও অনুধ্যান

সংকলনে : মানিক উইলভার ডি'কস্তা

(পূর্ব প্রকাশের পর)

গ॥ সাধু যোসেফ-এর বর্ষঃ দয়া ও অনুগ্রহের দণ্ডমোচনকাল

পোপ ফ্রান্সিস ৮ ডিসেম্বর ২০২০ থেকে ৮ ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত একটি বছরকে সাধু যোসেফ-এর বর্ষ হিসেবে ঘোষণা দান করেছেন। পুণ্য দপ্তর এই বছরটিকে বিশেষ দয়া ও অনুগ্রহের সময়কালরূপে চিহ্নিত করে একটি ডিক্রির মাধ্যমে পূর্ণ দণ্ডমোচনের

সুযোগ ঘোষণা করেছেন। যে সকল খ্রিস্টভক্ত পুনর্মিলন এবং পবিত্র খ্রিস্টপ্রসাদ সংস্কার সমূহ বিশ্বাস ও গ্রহণ করেন এবং পুণ্য পিতার সার্বজনীন প্রার্থনা সমূহের সাথে একাত্ম থাকেন তারা বিশেষ সুযোগ গ্রহণের মাধ্যমে দণ্ডমোচন লাভে সক্ষম বলে ঘোষণা করেছেন পুণ্য পিতার Apostolic Penitentiary।

পূর্ণ দণ্ডমোচন লাভের নিমিত্তে বিশেষ সুযোগ সমূহ

সাধু যোসেফ'র বর্ষে পূর্ণ দণ্ডমোচন লাভ করবেনঃ

- যে'সকল খ্রিস্টভক্ত অন্তত ৩০ মিনিট প্রভুর প্রার্থনা ধ্যান করবেন, অথবা সাধু যোসেফ'র বিষয়ে অন্তত একদিন নির্জন ধ্যানে অংশগ্রহণ করবেন।
- যে'সকল খ্রিস্টভক্ত সাধু যোসেফ'র জীবন উদাহরণ অনুসারে আধ্যাত্মিক ও দৈহিক করুণা ও দয়ার কাজ করবেন।
- পরিবার এবং বিবাহের উদ্দেশ্যে বাগ্‌দানকারী নর-নারী যারা পবিত্র জপমালা প্রার্থনা করবেন।
- প্রত্যেক ব্যক্তি যারা তাদের দৈনিক কর্মকাণ্ড সাধু যোসেফ'র নিকট সুরক্ষার নিমিত্তে অর্পন করেন এবং প্রত্যেক খ্রিস্টভক্ত যারা মর্যাদপূর্ণ কাজ বা চাকরী লাভের জন্য সাধু যোসেফ'র মধ্যস্থতায় প্রার্থনা করেন।
- যে'সকল খ্রিস্টভক্ত সাধু যোসেফ'র স্তব ও সাধু যোসেফ'র নিকট অন্য যে কোন প্রার্থনার মাধ্যমে দেশে ও দেশের বাইরে নির্যাতিত মণ্ডলীর জন্য এবং নির্যাতনে যাতনাভোগী খ্রিস্টভক্তগণের মুক্তিলাভের উদ্দেশ্যে মিনতি জানাবেন।
- এছাড়াও, যে'সকল খ্রিস্টভক্ত সাধু যোসেফ'র সম্মানার্থে মণ্ডলী অনুমোদিত যে কোন প্রার্থনা ও দয়ার কাজ উৎসর্গ করবেন, বিশেষভাবে ১৯ মার্চ ও ১ মে তারিখে এবং প্রতি মাসের ১৯ তারিখ ও প্রতি বুধবার।
- কোভিড-১৯ মহামারীর এই সময়ে যারা অসুস্থ, বয়স্ক, মৃত্যুপথযাত্রী এবং যাদের ঘর হতে বাইরে যাওয়ায় বাধা আছে সেই সকল ব্যক্তি।

পুণ্যপিতার Apostolic Penitentiary **যাজকগণকে স্বেচ্ছায় ও নম্রতা সহকারে অধিকতর পালকীয় মনোভাব সহযোগে অসুস্থদের জন্য পুনর্মিলন এবং পবিত্র খ্রিস্টপ্রসাদ সংস্কার উদ্‌যাপনে উৎসাহিত করেছেন।**

ঘ॥ সাধু যোসেফ-এর বর্ষে পালকীয় কার্যাবলী'র প্রস্তাবনা

ব্যক্তিগত পর্যায়েঃ

১. বিশেষ কোন পারিবারিক উদ্দেশ্যে বছরব্যাপী সাধু যোসেফের মধ্যস্থতা কামনা করে প্রার্থনা করা এবং সাধু যোসেফের নিকট ভক্তি প্রার্থনা নিবেদন করা।

২. সাধু যোসেফের গুণাবলী সম্পর্কে গভীরভাবে জানা, ধ্যান করা ও অনুসরণ করা।

৩. প্রতিদিন জপমালা প্রার্থনা করা ও পোপ ফ্রান্সিস প্রদত্ত সাধু যোসেফ-এর বর্ষের প্রার্থনাটি নিবেদন করা।

৪. সাধু যোসেফের নামে উৎসর্গীকৃত ডাইয়োসিসের এক বা দু'টি ধর্মপল্লীতে তীর্থযাত্রা করা।

৫. মণ্ডলীর ঐতিহ্য অনুযায়ী প্রতি বুধবার ও সম্পূর্ণ মার্চ মাসব্যাপী সাধু যোসেফের নিকট প্রার্থনা করা। এই সময়ে মণ্ডলী অনুমোদিত বিভিন্ন প্রার্থনা ব্যবহার করা যেতে পারে।

৬. সাধু যোসেফের পর্বদিন সমূহ (১৯ মার্চ ও ১ মে) পবিত্র খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণ করে ভক্তিপূর্ণভাবে পালন করা।

৭. সাধু যোসেফ-এর বর্ষ উপলক্ষ্যে ডাইয়োসিস কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করা।

৮. দৈনিক পারিবারিক প্রার্থনায় সাধু যোসেফের নিকট প্রার্থনা নিবেদন করা।

৯. সাধু যোসেফের প্রতি ভক্তি নিবেদনে অন্যান্য খ্রিস্টভক্তদের অনুপ্রেরণা দান করা।

১০. সাধু যোসেফ-এর বর্ষ উপলক্ষ্যে পুণ্য দপ্তর কর্তৃক ঘোষিত পূর্ণ দণ্ডমোচন লাভের সুযোগ গ্রহণ করা।

ধর্মপল্লী পর্যায়ে:

১. সম্ভব হলে প্রতি বুধবার, অথবা অন্তত মাসের তৃতীয় বুধবার সাধু যোসেফের স্মরণে খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করা।
২. দৈনিক খ্রিস্টযাগের পরে সাধু যোসেফের নিকট একটি প্রার্থনা নিবেদন করা, যেমন: সাধু যোসেফের স্তব।
৩. মার্চ মাসে ধর্মপল্লীর প্রতি গৃহে সাধু যোসেফের স্মরণে বিশেষ প্রার্থনা সভা আয়োজন করা।
৪. ১৯ মার্চ সাধু যোসেফের মহাপর্ব ও ১ মে স্মরণ দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করা।
৫. ধর্মপল্লীর নিয়মিত ধর্মশিক্ষায় (শিশু, যুব ও বয়স্ক) সাধু যোসেফের গুণাবলীসমূহ বিষয়ে শিক্ষা দান করা।
৬. ধর্মপল্লীর বুলেটিন/ নিউজ লেটার/ ফেসবুক পেইজে সাধু যোসেফ-এর বর্ষ সম্পর্কে প্রচার-প্রচারণা চালানো।

ডাইয়োসিস পর্যায়ে:

১. সাধু যোসেফে-এর বর্ষ উপলক্ষে ডাইয়োসিসের বিশপ কর্তৃক পালকীয় পত্র প্রকাশ করা।
২. পুণ্য পিতার প্রৈরিতিক পত্র- 'এক পিতার হৃদয় দিয়ে'র আলোকে ডাইয়োসিসের পালকীয় সম্মিলনী আয়োজন করা, পালকীয় অনুধ্যানের মূলসুর নির্ধারণ করা ও পালকীয় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা।
৩. পোপ ফ্রান্সিস প্রদত্ত সাধু যোসেফ-এর বর্ষের প্রার্থনাটি ছবিসহ কার্ড আকারে প্রকাশ করা।
৪. সাধু যোসেফ-এর বর্ষ উপলক্ষ্যে বিশেষ পালকীয় ব্যানার ও পারিবারিক পোস্টার প্রকাশ করা।
৫. ডাইয়োসিসের নিউজলেটার, ওয়েবপেইজ ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোতে সাধু যোসেফ-এর বর্ষ সম্পর্কে যথেষ্ট প্রচার-প্রচারণা চালানো ও নিয়মিত তথ্য পরিবেশ করা।
৬. সাধু যোসেফের কাছে উৎসর্গীকৃত ডাইয়োসিসের একটি গির্জাকে সাধু যোসেফ-এর বর্ষে বিশেষ তীর্থস্থানরূপে ঘোষণা করা ও নির্দিষ্ট দিনে তীর্থোৎসব আয়োজন করা।
৭. ক্যাথিড্রাল গির্জায় ১৯ মার্চ সাধু যোসেফের মহাপর্ব ও ১ মে স্মরণ দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন ও উদ্‌যাপন করা।
৭. বিভিন্ন কমিশন, মুভমেন্ট, এসোসিয়েশন কর্তৃক সাধু যোসেফ-এর বর্ষ পালনে বিভিন্ন ধরণের সৃষ্টিশীল কর্মসূচী গ্রহণ করা এবং শিশু, যুব, বয়স্ক, সন্ন্যাসব্রতী ও যাজকগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

সহায়ক সূত্র:

1. Apostolic Letter 'Patris Corde' of the Holy Father Francis on the 150th Anniversary of the proclamation of Saint Joseph as Patron of the Universal Church (8 December 2020).
2. Church grants plenary indulgence for year of St. Joseph, 8 December 2020, www. vaticannews.va.
3. Saint Joseph Biography, Updated: 30 September 2020, Original: 19 March 2018, biography.com.
4. St. Joseph, Catholic Online, www.catholic.org.
5. Saint Joseph, From Wikipedia, the free encyclopaedia, www. en.wikipedia.org.

(সমাপ্ত)

মায়ের দশম মৃত্যুবার্ষিকী

প্রয়াত ফিলোমিনা কোড়াইয়া
জন্ম : ২০ এপ্রিল, ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ১৩ মে, ২০১১ খ্রিস্টাব্দ
রাঙ্গামাটিয়া ধর্মপল্লী. কালীগঞ্জ, গাজীপুর।

দশটি বৎসর কিভাবে যে পার হয়ে গেল মা আমরা এখনও বুঝতে পারি-নি। তুমি ছিলে আমাদের পরিবারের সাত ভাইবোনের ভালোবাসার একজন সাথী। তোমার মাঝে আমরা পেতাম পরম শান্তি। প্রতিদিন প্রার্থনার সময় তোমার কথা স্মরণ করি। তুমি আমাদের ছেড়ে এখন পরম পিতার কাছে আছো। প্রতিবারের ন্যায় ১৩ মে, ২০১১ খ্রিস্টাব্দের পর আবার বছর ঘুরে এসেছে মা তোমার বিদায়ের সেই দিনটি। আজো তোমার কথা, তোমার সেই হাসি মাখা মুখ তোমাকে স্মরণ করিয়ে দেয় । তুমি ছিলে, তুমি আছো, তুমি আমাদের হৃদয়ে থাকবে চিরদিন চিরকাল। এই মর্তধামে আমাদের রেখে গেছো তুমি তোমার স্মৃতিটুকু। আমাদের বিশ্বাস তুমি আছো পরম পিতার কাছ থেকে আমাদের জন্য প্রার্থনা করো আমরা তোমার সন্তানেরা যেন তোমার আশীর্বাদে সবাই ভালো থাকতে পারি।

ঈশ্বর তোমার আত্মাকে অনন্তধামে চির শান্তি প্রদান করুন।

তোমারই
স্নেহের সন্তানেরা

বিজ্ঞ/১৩৩/২১

মূল্যবোধ

অন্তিম নকরেক

"সৃষ্টির সকল প্রাণীকে ভালোবাসতে শিখি
অসহায় মানুষকে আপন ভাবতে শিখি।"

এক ভদ্রলোক ডিম বিক্রেতাকে জিজ্ঞেস করলেন, "ডিম কত টাকা করে বিক্রি করছেন?" বৃদ্ধ ডিম বিক্রেতা বললেন, স্যার পাঁচ টাকা করে প্রতিটা। ভদ্রলোকটি বললেন, আমি ৬টি ২৫ টাকা দেব, না হয় চলে যাবো। বৃদ্ধ বিক্রেতা উত্তর দিলেন, আসেন স্যার, নিয়ে যান আপনার দামে। কারণ আজ সারাদিন একটিও বিক্রি করতে পারিনি। আপনার মাধ্যমেই আজকের বিক্রি শুরু। ভদ্রলোকটি ডিম কিনে জিতে গেল। তারপর ভদ্রলোকটি তাঁর দামী গাড়ীতে চড়ে তার বন্ধুদের সাথে একটি নামিদামী রেস্তোরাঁতে গেলেন। সেখানে তিনি ও তার বন্ধুরা তাদের পছন্দসই অনেক কিছু অর্ডার করলেন। কিন্তু যা অর্ডার দিলেন তার স্বল্প মাত্র খেলেন আর বেশিরভাগ খাবার রেখে দিলেন। তারপর তিনি বিল দিতে গেলেন। বিল আসলো ১,৪০০ টাকা। তিনি দিলেন ১,৫০০ টাকা এবং রেস্তোরাঁ মালিককে বললেন বাকিটা রেখে দিতে। এব্যাপারটা রেস্তোরাঁ মালিকের কাছে খুবই স্বাভাবিক হতে পারে কিন্তু দরিদ্র বৃদ্ধ ডিম বিক্রেতার কাছে খুবই বেদনাময়। ভদ্রতার চাদরে আসলে আমরা আমাদের

মূল্যবোধ হারিয়ে ফেলেছি। তাই যখনই কোন অসহায়, বৃদ্ধ, গরিব লোকের কাছ থেকে কিছু ক্রয় করবেন তখন তাকে মূল্যের চেয়ে একটু বেশি দেয়ার চেষ্টা করবেন॥

কেমন তোমার ছবি এঁকেছি!

অঙ্কিত হিলারী কোডাইয়া
৭ম শ্রেণি
সেন্ট নিকোলাস উচ্চ বিদ্যালয়

মা

সপ্তর্ষি

ভুমিষ্ঠ হয়েছি এই সুন্দর ধরণীতে
মা তোমার শ্রেষ্ঠ ভালবাসাতে।
আদর সোহাগে আগলে রেখেছে মোরে
কষ্টের জ্বালা তুমি হৃদয়ে চেপে রেখে।
আমার খুশিতে তুমি হয়েছে কত খুশি
আমার দুঃখ ব্যথাতে হয়েছে ব্যথী।
কত রাত নির্ঘুমে জেগে ছিলে তুমি
অসুস্থ যখন বিছানায় শুয়েছিলাম আমি ।
কতদিন অনাহারে ছিলে আমাকে খাইয়ে
নিজে না খেয়ে খাওয়ার অভিনয় করে।
কনকনে শীতে ছেঁড়া কাঁথায় আমায় জড়িয়ে
পার করেছ রাত ঘুমপাড়ানি গান গেয়ে।
জীবনে কোনদিন চাওনি কোন প্রতিদান
নিস্বার্থভাবে ভালবেসেছ মা আমাকে।
মা দিবসে আজ করি তোমাকে অনুনয়
হারিয়ে যেয়ো না মা একা করে আমায়।

হে মহান শ্রমিক

রাত্রি ক্যাথারিনা রোজারিও

শ্রমিক তুমি পরিশ্রমী,
তুমি কর্মঠ ও সৎ
তুমি ত্যাগী, তুমিই সহনশীল
তুমি দরদী মানব।

শ্রমিক তুমি রাষ্ট্রপ্রধান
শ্রমিক তুমি উকিল,
তুমি মন্ত্রী,তুমি মিনিস্টার
তুমিই আবার চাকর।

শ্রমিক তুমি ব্যবসায়ী।
তুমি ঘর সামলাও, দেশ সামলাও
আমাদের এই বিশ্বকে সামলাও।

তুমি কষ্টস্বীকার কর
অন্যের অপমান সহ্য কর,
তুমি সাহসী বীর
তবুও উচুঁ কর না তোমার শির।

শ্রমিক তুমি নিজের জীবন বাজী রেখে
অন্যের কথা ভাব,
কেউ কি তোমাকে বুঝতে পারে?
কেউ কি তোমাকে সম্মান দিয়েছে?
আমরা সবাই শ্রমজীবী

আমরা জয়ী হই,
সত্য পথে চলে মোরা
ভালবেসে একসাথে রই॥

বিশ্ব মণ্ডলীর সংবাদ

কোভিড-১৯ প্রকোপ থেকে রক্ষা পেতে ভারতীয় খ্রিস্টানদের উপবাস ও প্রার্থনা দিবস পালন

ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

করোনা মহামারীর আক্রমণে ভারত দিশেহারা। প্রতিদিনই লক্ষাধিক মানুষ আক্রান্ত হচ্ছে এবং তিন সহস্রাধিক মানুষ মৃত্যুবরণ করছে। করোনা মাহামরী থেকে রক্ষা পেতে ভারতের কাথলিক বিশপ সম্মিলনী খ্রিস্টবিশ্বাসীদেরকে আহ্বান করেন মে মাসের ১ম শুক্রবারে উপবাস ও প্রার্থনা করতে। বিশপ সম্মিলনীর প্রেসিডেন্ট বোম্বের আর্চবিশপ কার্ডিনাল ওসওয়ার্ল্ড গ্রাসিয়াস এই দিনটি পালন করতে দেশের সকল বিশপকে ক্যাথিড্রালে বা বিশপ হাউজে উপস্থিত থেকে মধ্যাহ্ন প্রার্থনায় অংশ নিতে বলেন। কার্ডিনাল তার ডায়োসিসের জন্য প্রার্থনা অনুষ্ঠান প্রস্তুত করেন যেখানে নীরবতা, উদ্দেশ্য প্রার্থনা, মঙ্গলসমাচার পাঠ ও অনুধ্যান (জলের উপর দিয়ে যিশুর হাঁটা) এবং মা মারীয়ার মধ্যস্থতা চেয়ে শেষ প্রার্থনা।

দেশের জন্য প্রার্থনা: এই বৈশ্বিক মহামারীর সময়, আমরা অসুস্থ ও যন্ত্রণাক্লিষ্ট, যারা ভীত ও উদ্বিগ্ন তাদের জন্য প্রার্থনা করি - একথা বলে প্রার্থনানুষ্ঠান শুরু হয়। ডাক্তার, নার্স, হাসপাতাল ও চিকিৎসা কর্মী, পরিবারের সদস্যবৃন্দ ও স্বেচ্ছাসেবকগণ যারা সম্মুখসারিতে থেকে কোভিড-১৯ আক্রান্তদের সেবা করছে তাদের জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়ে এবং তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানানো হয়। তাদের জন্য নিরাপত্তা, সুস্বাস্থ্য ও শক্তি চেয়েও প্রার্থনা করা হয়। সিদ্ধান্তগ্রহণকারী ও আইনপ্রণেতাদের জন্য প্রার্থনা করা হয় যেন তারা নিরপেক্ষ ও যথার্থভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণে ও কর্মে পরিচালিত হতে পারেন; যাতে করে জনগণ মহামারী মোকাবেলা করে এর

শক্তিকে পরাজিত করতে পারে। বিশ্ব প্রকৃতির জন্যও প্রার্থনা করা হয়। বিশেষ করে মানুষের দ্বারা পৃথিবীর যে ক্ষতি করা হচ্ছে সে সম্বন্ধে সচেতন হয়ে যেন সকলে দায়িত্বশীল আচরণ করে। যারা ভঙ্গুর ও দুর্বল সৃজনশীলভাবে যেন তাদের প্রতি যত্ন ও সহমর্মিতা প্রকাশ করা হয়। কোন কোন বিশপ এ ধরণের প্রার্থনার সাথে সাক্রামেন্তীয় আরাধনা ও পবিত্র জপমালা প্রার্থনা রাখারও অনুরোধ করেন।

আন্তমাণ্ডলিক উদ্যোগ : ভারতের কাথলিক বিশপদের উদ্যোগের সাথে আরো কিছু মণ্ডলী প্রার্থনায় অংশ গ্রহণ করেন। ভারতের জাতীয় চার্চ পরিষদ এ প্রার্থনায় অংশগ্রহণ করে বলেন, এই দুঃখ যন্ত্রণার সময় যখন হাজার-হাজার ভারতীয় মারা যাচ্ছে তখন আমরা প্রার্থনায় আপনাদের সাথে একাত্মতা ও সংহতি প্রকাশ করছি। ৭ মে তারিখের প্রার্থনায় বিভিন্ন প্রার্থনা উপকরণ দিয়ে বিশ্ব চার্চ পরিষদ সহায়তা করেছিল।

পোপ মহোদয়ের প্রার্থনা আন্দোলন : গত বৃহস্পতিবার (৬ মে,২০২১) পোপ ফ্রান্সিস কার্ডিনাল গ্রাসিয়াসকে এক বার্তাতে জানান, ভারতের এই চরম স্বাস্থ্য সংকটে তিনি মানুষের সাথে ঘনিষ্ঠতা ও সংহতি প্রকাশ করছেন। যখন তিনি প্রত্যেকের নিরাময় ও সান্ত্বনার জন্য প্রার্থনা করছেন তখন তিনি বিশেষভাবে রোগি, অসুস্থ, মৃত এবং মৃতদের পরিবারের সদস্যদের স্মরণ করছেন। যারা অক্লান্তভাবে পরিশ্রম করে স্বাস্থ্যসেবার কাজ করে যাচ্ছেন তাদের প্রশংসা করছেন পোপ মহোদয়। মহামারীর সমাপ্তি ও স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার জন্য পোপ মহোদয় মে মাসে 'ম্যারাথন প্রার্থনার' উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। সারাবিশ্বের ৩০টি মা মারীয়ার তীর্থস্থান সম্পৃক্ত হবে এবং একেকদিন নির্দিষ্ট তীর্থস্থানের ব্যবস্থাপনায় নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নিয়ে রোজারিমালা প্রার্থনা হবে। ১ মে তারিখে পোপ মহোদয় রোজারি ম্যারাথনের উদ্বোধন করেন সাধু পিতরের মহামন্দির থেকে। প্রতিদিনই রোজারিমালা প্রার্থনা সরাসরি সম্প্রচার হয় ভাতিকান নিউজ থেকে রোমের সময় সন্ধ্যা ৬টায়। - **তথ্যসূত্র :** *news.va*

তোমরা আছ তোমরা থাকবে, আমাদের হৃদয়ের মাঝে

মে মাসে বিশ্ব মা দিবস পালিত হয়। যখন সবাই মাকে ভালবাসা জানায় তখন আমরা তোমাকে ভালবাসা জানাতে পারি না! তোমাদের হারানোর এ ব্যথা কাউকে বুঝানো যাবে না। প্রতিনিয়ত আছ তোমরা আমাদের প্রার্থনায়, যতদিন বেঁচে থাকব ততদিন তোমরা আমাদের প্রার্থনায় থাকবে।

বিশ্বাস করি তোমরা আমাদের জন্য সর্বদা প্রার্থনা করো।

প্রিয় পাঠক আমার মায়ের মৃত্যুবার্ষিকী ১৬ মে, বাবার মৃতুবার্ষিকী ৩০ জুন, সকলেই প্রার্থনায় স্মরণ করবেন।

আমরা ভালো আছি তোমরা ভাল থাক।

প্রয়াত জন দাড়িয়া
মৃত্যু : ৩০ জুন, ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দ
লক্ষ্মীবাজার ধর্মপল্লী

পরিবারের পক্ষে তোমার সন্তানেরা
মেরী তেরেজা বিশ্বাস
লক্ষ্মীবাজার ধর্মপল্লী

প্রয়াত আঞ্জেলা দাড়িয়া
মৃত্যু : ১৬ মে, ২০০০ খ্রিস্টাব্দ
লক্ষ্মীবাজার ধর্মপল্লী

বিজ্ঞ/১৩২/২১

"প্রভু যিশু যুব সংঘ" এর আয়োজনে পাগাড় ধর্মপল্লীতে বাইবেল শিক্ষা-সম্মেলন

দর্প মাইকেল রোজারিও ▯ গত ১৩ নভেম্বর, ২০২০ খ্রিস্টাব্দে পাগাড় ধর্মপল্লীতে পাগাড় গ্রামের নবপ্রতিষ্ঠিত সংঘ, প্রভু যিশু যুব সংঘের উদ্যোগে সমগ্র পাগাড় বাসীদের নিয়ে অনুষ্ঠিত হয় সংঘের প্রথম বড় কার্যক্রম, "বাইবেল শিক্ষা সম্মেলন, ২০২০"।

মূলসুর বেছে নেয়া হয় "এসো বাইবেলের আলোকে পথ চলি।"

সকাল ৯ টায়, ফাদার প্যাট্রিক শিমন গমেজ এর পরিচালনায় শুরু হয় প্রথম সেশনে বাইবেল সহভাগিতা মাধ্যমে। দুপুর ১২ টায় পবিত্র খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করা হয়। দুপুরের আহারের পরপরই শুরু হয় সেশন যার পরিচালনায় ছিলেন ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু। বাইবেল সহভাগিতার পাশাপাশি বর্তমানে আমরা কিভাবে ফেসবুক এবং অন্যান্য যোগাযোগ মাধ্যমের সহযোগিতায় খ্রিস্টীয় মূল্যবোধ ও শিক্ষা, অন্যদের কাছে প্রচার করতে পারি সেই বিষয়টিকেই ফাদার তার আলোচনায় তুলে ধরেন। এছাড়াও শিক্ষা সম্মেলনটিকে সুন্দর ও সার্থক করার জন্য শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সার্বিকভাবে সাহায্য ও সহযোগিতা করেছেন পাগাড় ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত ফাদার জেভিয়ার পিউরিফিকেশন। নতুন সংঘের কার্যক্রম, এর উপর এই করোনা পরিস্থিতি অংশগ্রহনকারী একটু কমই হবে ভেবে প্রথমে ৬০ জনের আয়োজন করা হয়। কিন্তু ঈশ্বরের আশীর্বাদে এই সংখ্যা বেড়ে প্রথমে ১০০ জন, তারপর ১৭০ জন, এই ভাবে করতে করতে পরিশেষে অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা হয় ২২২ জন এবং সর্বমোট ৩০০ জনের আয়োজন করা হয়। করোনা পরিস্থিতিতে সকল স্বাস্থ্যবিধি মেনেই সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানটি আয়োজন করা হয়। বিকাল ৪ টায় বাইবেল কুইজ প্রতিযোগিতার পুরষ্কার বিতরণী এবং ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের মধ্যদিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে॥

রাজশাহী সাধু পিতরের ধর্মপল্লীতে শিশুমঙ্গল উদ্‌যাপন

ফাদার সুনীল রোজারিও ▯ গত ২১ মার্চ রাজশাহী সিটির মুশরইল অবস্থিত সাধু পিতরের ধর্মপল্লীতে পবিত্র শিশুমঙ্গল দিবস উদ্‌যাপন করা হয়েছে। সরকারি স্বাস্থ্যবিধি মেনে সকাল ৯টার সময় আদিবাসী সংস্কৃতি অনুসারে শোভাযাত্রা করে শিশুরা প্রধান গির্জায় প্রবেশ করে। অনুষ্ঠানে পৌরহিত্য করেন ধর্মপল্লীর প্রধান ফাদার উইলিয়াম মুর্মু এবং তাকে সহযোগীতা করেন ফাদার সুব্রত কস্তা। ফাদার মুর্মু খ্রিস্টযাগের সময় তার উপদেশে বলেন, যিশু শিশুদের ভালোবাসতেন। তিনি তাঁর শিষ্যদের বলেছিলেন, "শিশুদের আমার কাছে আসতে দাও।" শিশুরা হলো নিষ্পাপ এবং স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করতে হলে সবাইকে শিশুদের মতো নিষ্পাপ হতে হবে। ফাদার অভিভাবকদের উদ্দেশ্যে বলেন, "শিশুরা যেমন পরিবারের, সমাজের, রাষ্ট্রের তেমনি মণ্ডলীর। তাই আপনাদের প্রধান দায়িত্ব হলো, ওদের সুশিক্ষা দিয়ে গড়ে তোলা যেনো ভবিষ্যতে পরিবার, সমাজ, মণ্ডলী এবং দেশের সুনাগরিক হিসেবে গড়ে উঠতে পারে।" খ্রিস্টযাগের পরে ছিলো সংক্ষপ্তি আকারে গির্জা চত্বরে শান্তির শোভাযাত্রা করা হয়। পরে শিশুদের নিয়ে নানা ধরণের খেলাধূলা, বাইবেল কুইজ এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। দুপুরের খাবারের পর বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। সারাদিনব্যাপী অনুষ্ঠানে সহায়তা করেন শিশু মঙ্গলের এনিমেটর, ধর্মপল্লীর সিস্টার এবং সাধু পিতর সেমিনারির শিক্ষার্থীগণ। করোনাভাইরাসের কারণে গত প্রায় এক বছর ধরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকায় শিশুরা সবচেয়ে বেশি ভুক্তভোগী। উল্লেখ্য, সাধু পিতর ধর্মপল্লীর সন্তোষপুর, মিরকামারি এবং কেন্দ্রের মুশরইল গ্রাম থেকে ১২০জন শিশু উপস্থিত ছিলো।

রাজশাহী লুর্দের রাণী ধর্মপল্লীতে আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালন

ফাদার বিকাশ হিউবার্ট রিবেরু ▯ গত ৮ মার্চ, ২০২১ খ্রিস্টবর্ষ লুর্দের রাণী মারীয়ার ধর্মপল্লীতে উদ্‌যাপন করা হয় আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২১। সকাল ৮টায় নাম নিবন্ধনের মধ্যদিয়ে দিনের কায়ক্রম শুরু হয়। সকাল ৯ ঘটিকায় নারী দিবসের বিশেষ খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন বনপাড়া সাধু ৬ষ্ঠ পল সেমিনারীর আধ্যাত্মিক পরিচালক ফাদার পল পিটার কস্তা। খ্রিস্টযাগ শেষে পাল-পুরোহিত ফাদার বিকাশ হিউবার্ট রিবেরু অংশগ্রহণকারী নারীদের উদ্দেশ্য শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন। মুলসূরের উপর সহভাগিতা করেন ফাদার পল পিটার কস্তা। অতপর হালকা জলযোগ গ্রহণের ব্যবস্থা করা হয়। পরিশেষে, নারী দিবসে সকল নারীদের সার্বিক কল্যাণ কমনা করে ও ঈশ্বরকে আর্শীবাদ যাচ্না করে নারী দিবসের র্কাক্রম শেষ করেন পাল-পুরোহিত ফাদার বিকাশ রিবেরু॥

চির বিদায়ের চতুর্থ বছর

স্মৃতিতে অম্লান তুমি

প্রিয় বাবা,

সময়ের স্রোতে আরও একটি বছর পার হয়ে গেল। আমাদের জীবনের সবচেয়ে বেদনাময় দিনটি ছিল ২১ মে রবিবার, ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ। বিশ্রামবারেই তুমি চিরদিনের জন্য বিশ্রাম নিয়েছ পিতার কোলে। তোমার শূন্যতা প্রতিক্ষণে আমাদের কষ্ট দেয়। তোমার স্নেহ, ভালোবাসা, আদর্শ, শাসন প্রতিনিয়ত অনুভব করি। তুমি ছাড়া আমরা যে বড় অসহায়। আমরা বিশ্বাস করি, এ পৃথিবীতে তুমি যে ভালো কাজ করে গেছ তার পুণ্যগুণে পিতা পরমেশ্বর তোমাকে স্বর্গে স্থান দিয়েছেন। স্বর্গ থেকে তুমি আমাদের জন্য প্রার্থনা করো ও আশীর্বাদ করো। তুমি আছ আমাদের প্রার্থনায়, ভালোবাসায়, আদর্শে হৃদয়ের মণিকোঠায়।

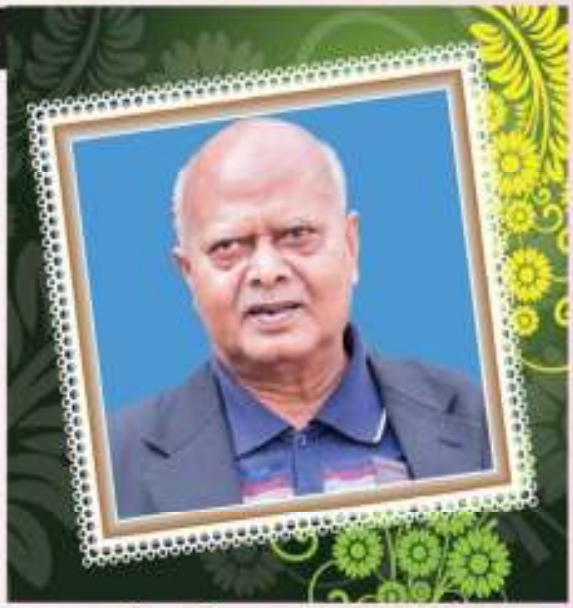

প্রয়াত বীর মুক্তিযোদ্ধা সমর লুইস ডি'কস্তা
জন্ম : ১২ জুন, ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ২১ মে, ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ
তুমিলিয়া মিশন, ভেটুর
কালীগঞ্জ, গাজীপুর।

তোমার আত্মার শান্তি কামনায় –
স্ত্রী : সেলিন ডি'কস্তা
মেয়ে-মেয়ে জামাই, ছেলে ও ছেলে বৌ
নাতি-নাতনীগণ : উইলিয়াম, হ্যারী, জুনিক, জয়শ্রী, আদৃত ও এঞ্জিলা।

প্রয়াত বার্নার্ড গমেজ
আগমন: ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দ
প্রস্থান: ৪ জুলাই, ২০১২ খ্রিস্টাব্দ

প্রয়াত সবিতা আগ্নেস কস্তা
আগমন: ৮ জানুয়ারি, ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দ
প্রস্থান: ১৬ মে, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

"মরণ সে তো শেষ নয়, ভক্ত প্রাণের নেইতো ক্ষয়। জীবন যাদের পুণ্যে ভরা সবার তরে মরে যারা, উদার প্রাণের বিনিময়ে তাঁরাই বেঁচে রয়"

প্রিয় বাবা ও মা,

নিয়তির বর্ষ পরিক্রমায় তোমাদের চিরবিদায়ের দিনটি প্রতিবছর এসে হাজির হয় আমাদের দ্বার প্রান্তে, হৃদয় গভীরে আরো বেশি করে অনুভব করি তোমাদের অনুপস্থিতির নিষ্ঠুর শূন্যতা। হাজারো মানুষের ভিড়ে আজও খুঁজি তোমাদের সেই আগলে রাখা ভালোবাসাপূর্ণ মুখগুলো। প্রতিদিন ভোর হয়, জেগে উঠি সবাই কিন্তু তোমাদের তো আর জাগাতে পারলাম না! অনন্ত ঘুম তোমাদের সঙ্গী হলো। আমাদের জীবনে তোমরা ছিলে বটবৃক্ষের ছায়া, নিরাপদ আশ্রয়স্থল, জীবনাদর্শের উৎস, ভালোবাসার খনি। মৃত্যু জীবনের শেষ নয়, অনন্ত জীবনে প্রবেশদ্বার মাত্র, স্বর্গ থেকে আমাদের সকলের জন্য আশীর্বাদ করো, যেন তোমাদের রেখে যাওয়া খ্রিষ্ট-বিশ্বাস, ভালোবাসা ও জীবনাদর্শে নিত্যদিন পথ চলতে পারি। পুনরুত্থানের আনন্দে অনন্তকাল পরম শান্তিতে থেকো পরম পিতার কোলে। আদর্শে, বিনম্র শ্রদ্ধায় ও ভালোবাসায় বেঁচে থেকো আমাদের সকলের হৃদয় মন্দিরে চিরকাল।

তোমাদের রেখে যাওয়া শোকাহত–
ফুলমতি-রাণী-ফা: তপন-রিপন-রুপা, সি: রোজেন SMRA, চন্দন-লাকী-নিশীতা-নীলা, রঞ্জন-মমতা-কলিন্স-প্রিয়াংকা, ব্রাদার নির্মল CSC, কল্পনা-স্বপন-পূজা-কেয়া-কান্তা, লিটন-নীলা-অন্তর-অন্বিতা এবং অপরাপর আত্মীয়, প্রতিবেশী, বন্ধু-বান্ধব ও শুভাকাঙ্ক্ষি সকলে

বর্ষ ৮১ ❖ সংখ্যা - ১৭
THE WEEKLY PRATIBESHI
Issue - 17
বর্ষ ৮১ ❖ সংখ্যা - ১৭
Regd. No. DA-53
❖ 16 - 22 May, 2021, ২ - ৮ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

BOOK POST

তোমার অনন্ত যাত্রার পঞ্চম বার্ষিকী স্মরণে

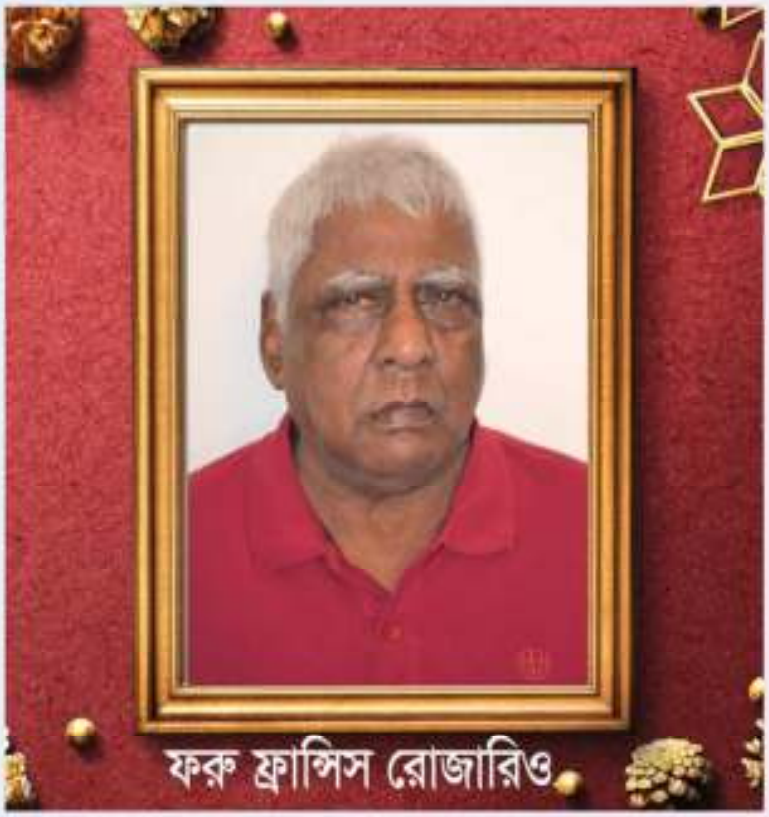

ফরু ফ্রান্সিস রোজারিও

জন্ম : ১৫ অক্টোবর, ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ৬ মে, ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ

শূন্যতা রেখে, কান্না ভুলে
বাবা আছি সুখে তোমার স্মৃতি নিয়ে।

বাবা,

তোমার শূন্যতা আজো অনুভূত হয় আমাদের সকলের মাঝে। তুমি চলে গেলেও পেছনে ফেলে গিয়েছ তোমার আদর্শ আর অফুরন্ত ভালোবাসা। তুমি পরম পিতার সেই স্বর্গীয় রাজ্য থেকে আমাদের সবাইকে আশীর্বাদ কর, যেন আমরা তোমার সেই আদর্শ আর ভালোবাসায় পথ চলতে পারি। একতাবদ্ধ হয়ে জীবনে এগিয়ে যেতে পারি। পরম করুণাময় পিতা ঈশ্বর তোমাকে চিরশান্তি প্রদান করুন।

শোকাহত পরিবারবর্গ
উলুখোলা, কালীগঞ্জ
গাজীপুর।

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro,** Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : 47113885, E-Mail : **wklypratibeshi@gmail.com,** Web: weekly-pratibeshi.org